ছাত্রপাঠ

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
23/1, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJI,
BENGAL MEDICAL LIBRARY, 201, CORNWALLIS STREET.

1889.

বিজ্ঞাপন।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়, ছাত্রপাঠে সঙ্কলিত হইল।

নানা বিষয়পাঠে, শিক্ষার্থীদিগের আমোদ ও আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ে, জ্ঞানের উন্মেষ হইতে পারে, এই জন্য, ছাত্রপাঠে, পুরাবৃত্ত, জীবনবৃত্ত, বিজ্ঞান, স্থানের বিবরণ ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে, এই সকল প্রবন্ধ, শিক্ষার্থিগণের ভাষাজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান বিষয়ে, কিয়দংশে ফলোপধায়ক হইলেই, চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা,
২রা ভাদ্র, ১২৯৬।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

ছাত্রপাঠ।

শিক্ষা।

শিক্ষা, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও হৃদয় সংস্কৃত করিবার প্রধান উপায়। বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হইলে, নানাবিধ সৎকার্য্যের বলে, পবিত্র সুখভোগের অধিকারী হওয়া যায় না; হৃদয় সংস্কৃত না হইলে, সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ ও সর্ব্বপ্রকার অনবদ্যতার মনোহর আভ-রণে অলঙ্কৃত হইতে পারা যায় না। শিক্ষা, বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে উন্মেষিত করে, এবং মানবী প্রকৃতিকে দেবভাবান্বিত করিয়া তুলে।

শিক্ষাপ্রভাবে যাহার হৃদয় সংস্কৃত হয় নাই, বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই, বিবেক কর্ত্তব্য-পথ প্রদর্শনে অগ্রসর হয় নাই, সে, পবিত্র মানব নামের যোগ্য নহে। জলধির অসীম বিস্তারে যেমন একই নীলিমা বিকাশ পায়, তাহার হৃদয় সেইরূপ অজ্ঞানের ঘোর অন্ধ-কারে আচ্ছন্ন থাকে। সে, কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইলেই আপ-নাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। প্রকৃতির কার্য্যকারণের সূক্ষ্ম অনু-সন্ধানে, আপনার কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের সূক্ষ্ম বিচারে, তাহার মন নিয়োজিত হয় না। সে, কেবল মহাসাগরের তরঙ্গাবলী দর্শনে ভীত হয়, উন্নতগিরি-শৃঙ্গে মেঘমালা দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করে এবং গভীর বজ্রনাদ ও দিগ্দাহকারী দাবানলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এইসকল ভয়ঙ্কর দৃশ্য যে, জড় জগতের অনন্ত শক্তির বিকাশ করিতেছে,

তাহা তাহার মস্তিষ্কে নীত হয় না, মানবগণ প্রতিভাপ্রভাবে এই শক্তিকে করায়ত্ত করিয়া পৃথিবীতে যে, অত্যদ্ভুত কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা ভাবিয়া, সে আনন্দ অনুভব করে না। কে তাহার সম্মুখে এই সকল ভয়ঙ্কর ও সুন্দর দৃশ্য প্রসারিত রাখিয়াছেন, কাহার অসীম শক্তির প্রভাবে এই জড় জগৎ ব্যবস্থাপিত হইয়া আপনার শক্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহা সে একবারও অনুধাবন করে না। সে কূর্ম্মের ন্যায় আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত থাকিয়া জীবিত কাল শেষ করে। সে বৃক্ষের অনায়াস-লব্ধ ফল ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, নির্ঝরবারি পান করিয়া তৃষ্ণা শান্তি করে, এবং অবলীলায় ও অসঙ্কোচে নানা প্রকার জুগুপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কিছুতেই তাহার চরিত্র সংগঠিত হয় না, জীবিতপ্রয়োজন সাধিত হয় না, বুদ্ধি বৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া সৎপথ অবলম্বন করে না। সে অজ্ঞানাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, অজ্ঞানাবস্থাতেই কালাতিপাত করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া থাকে।

সুশিক্ষা যাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণগ্রামে অলঙ্কৃত করিয়াছে, তিনি পৌর্ণমাসী রজনীর জ্যোৎস্না-বিধৌত কুমুদস্থলের ন্যায় পবিত্র ও কলঙ্ক শূন্য। তিনি নরলোকে থাকিয়াও দেব লোকের পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। পবিত্র চরিত্রের বলে, গভীর দূরদর্শি-তার সাহায্যে ও সুস্থির বিবেক-বুদ্ধির প্রসাদে, তিনি আপনার কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিয়া, বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করেন। কিছুতেই তাঁহার সাধনা প্রতিহত হয় না, কিছুতেই তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অবনত হইয়া পড়ে না। তিনি কখন ভূলোক হইতে সৌর জগতে উপস্থিত হইয়া গগন-বিহারী গ্রহগণের কার্য্য দেখিয়া পুলকিত হন, কখন পার্থিব জগতে অব-

তরণ পূর্ব্বক প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্বের নির্ণয় করিয়া, সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করেন, কখন অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে জ্ঞানালোকে আলোকিত ও পবিত্রতায় গৌরবান্বিত করিয়া তুলেন, কখনও বা মূর্ত্তিমতী দয়া ও ন্যায়পরতা হইয়া, রোগাতুরকে পথ্য, শোকসন্তপ্তকে সান্ত্বনা ও উচ্ছৃঙ্খলকে সদুপদেশ দিয়া সম্প্রীত করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয় অটলতা ও নির্ভীকতায় পূর্ণ থাকে, তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, সুখে, দুঃখে সুসময়ে, দুঃসময়ে অটল গিরিবরের ন্যায় সদা উন্নত রহে, তাঁহার ন্যায়পরতা ও দূরদর্শিতা সমস্ত বিঘ্নবিপত্তির দুশ্ছেদ্য আবরণ উন্মুক্ত করিতে যত্নপর হইয়া থাকে। তিনি এইরূপে পবিত্রতায় ভূষিত হইয়া সাধারণের অচিন্ত্য, অগম্য ও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহে অভিষিক্ত হইতে থাকেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সুশিক্ষাবলে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও হৃদয় সংস্কৃত হইয়া থাকে। যাহার হৃদয় সংস্কৃত হয় নাই, চরিত্র সংগঠিত হয় নাই, পবিত্রতা যাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় নাই, সে কখনও সুশিক্ষিত বলিয়া গণ্য নহে। যখন দেখিব, এক জন সাহিত্যে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে, গণিতে অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া, সকলকে চমকিত করিতেছে, দর্শনের জটিল অর্থের উদ্ভেদ করিয়া, আপনি মহাপ্রাজ্ঞ বলিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই যদি, সে, অত্যাচার ও অবিচারে সমাজকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে, তাহা হইলে, আমরা তাহাকে অশিক্ষিত বলিয়াই, কাতরভাবে চাহিয়া দেখিব। যে মস্তিষ্কের শক্তিতে মহীয়ান্ হইয়াও, হৃদয়ের শক্তিকে উপেক্ষা করে, সে সুশিক্ষিত নহে, সুশিক্ষিত নামের কলঙ্ক মাত্র, ঈদৃশী শিক্ষাও সুশিক্ষা নহে, কুশিক্ষার অপবিত্র ছায়ামাত্র।

হৃদয়ের শক্তি মার্জ্জিত ও উন্নত করা, যেমন সুশিক্ষার প্রয়োজন,

সেইরূপ স্বাবলম্বন-বলে অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, যথানিয়মে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাও, সুশিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। যে শিক্ষায় স্বাবলম্বন-শক্তির উন্মেষ হয় না, তাহা প্রকৃত "শিক্ষা" নহে। স্বাবলম্বন মানুষকে সর্ব্বদা উন্নত ও অবিচলিত রাখে। আত্মাবলম্বন না থাকিলে, কখনও কেহ, কোন দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়া, উন্নতিলাভে সমর্থ হয় না, এবং স্বাধীনতার সুখময় ক্রোড়ে লালিত হইয়া, অমর-স্পৃহণীয় পবিত্র সুখের আস্বাদ করিতে পারে না। আত্মাবলম্বন ও আত্মাদর থাকিলে, লোকে যে অবস্থাতেই পতিত হউক না কেন, সেই অবস্থায় থাকিয়াই অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনার উন্নতি সাধন করিতে পারে।

হৃদয়ের শক্তির পরিমার্জ্জন এবং আত্মাবলম্বন ও আত্মাদরের উন্নতিসাধনের সহিতই সুশিক্ষার প্রয়োজন শেষ হয় না। এই সকলের সহিত পরমাত্মনিষ্ঠা ও চিত্তসংযম থাকা আবশ্যক। পরমাত্মনিষ্ঠ ও সংযতচিত্ত না হইলে, শিক্ষা প্রগাঢ় ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপক হয় না। যে হৃদয় ঐশ্বরিকতত্ত্বে আকৃষ্ট নহে, সে হৃদয় বিশুষ্ক ও সে হৃদয় চিরশোভা-হীন। যিনি সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরকে ভুলিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে সংসারে বিচরণ করেন, তিনি প্রকৃতশিক্ষা-বিরহিত ও প্রকৃত সাধনা-শূন্য। প্রশান্ত রজনীর সুনীল আকাশ, প্রকৃতির কমনীয় কান্তি শত গুণে উজ্জ্বল করিতেছে; "লাবণ্য-শোভিত" পূর্ণ-চন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণে চারি দিক্ হাস্যময় করিয়া তুলিতেছে, তরঙ্গিণী জ্যোৎস্নারঞ্জিত হইয়া কলস্বরে সাগরের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এই সকল সুন্দর দৃশ্য, সকলেই দেখিয়া থাকে; কিন্তু প্রশান্ত আকাশ দেখিলে যাঁহার হৃদয় পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়, কমনীয় শশধরের হাস্য দেখিয়া, যাঁহার হৃদয় হাসিতে থাকে, স্রোতস্বতীর বিমল বারি-রাশির সহিত যিনি স্বীয় অশ্রু

প্রবাহ মিশাইয়া তদ্গতচিত্তে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরম দেবতার জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত ও তিনিই প্রকৃত সাধু। তিনি মানব হইয়াও দেবভাবে পরিপূর্ণ থাকেন, মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও অমরবাসের সুখাস্বাদে পরিতৃপ্ত রহেন। তাঁহার সুমধুর দেব-প্রকৃতি সর্ব্বদা অতুলনীয় ও স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে চিরপরিপূর্ণ।

অপূর্ব্ব দানশীলতা।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন কাহিনী যাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দু আর্য্যদিগের কীর্ত্তিকলাপে অবশ্য আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন, এবং অবশ্য সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষগণকে বিনম্রভাবে পবিত্র প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইবেন। আর্য্যগণের কীর্ত্তি কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই শেষ হয় নাই। বীরত্ব-বৈভবের সহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠা ও দানশীলতাপ্রভৃতি গুণে, তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর নিকট পূজা পাইয়া আসিতেছেন। প্রতাপসিংহ প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, বুদ্ধ প্রভৃতির ধর্ম্মনিষ্ঠার মোহিনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছে, শিলাদিত্য প্রভৃতির দানশীলতার অপূর্ব্ব মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতের ঐ অপূর্ব্ব দানশীলতার কয়েকটি কথা এ স্থলে বিবৃত হইতেছে।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে, যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অনেক রাজ্য আপনার

বিজয়-পতাকায়শোভিত করিতেছিলেন, যখন মহাবীর পুলকেশ আপনার অসাধারণ ভুজ-বলের মহিমায় মহারাষ্ট্ররাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, চীনদেশের চিরপ্রসিদ্ধ, দরিদ্র পরিব্রাজক হিউএন্ থসৃঙ্গ্ যখন নালন্দানামক স্থানের পবিত্র বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়ে, জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্রের পদতলে বসিয়া, আর্য্যগণের নানাশাস্ত্রের রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন, তখন মহারাজ শিলাদিত্য, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে, হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে, একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমি ঐ মহোৎসবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে ঐভূমি "সন্তোষ-ক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব, প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রধান ঘটনা। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিটপরিমিত ভূমি, গোলাপ পুষ্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে, স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকট ভোজনগৃহ সকল, বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইত। এক একটি ভোজনগৃহে একবারে প্রায় হাজার লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে ঘোষণা দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন,আত্মীয়-বন্ধু-শূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া,দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভী-রাজ্যের অধিপতি ধ্রুবপতি ও আসাম-রাজ ভাস্করবর্ম্মা, ঐ করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ঐ দুই করদ ভূপতির ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য,সন্তোষ-ক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত।

ধ্রুবপতির সৈন্তের পশ্চিমে, বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের শিবিরস্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা, বিশেষ পারিপাট্যশালী ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণ-সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে সন্তোষ-ক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন, দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহার চারি দিক সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। ঐ ক্ষেত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থলের পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন, ধ্রুবপতি ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে সৈন্যস্থাপন করিতেন। আর ভাস্করবর্ম্মা যমুনার দক্ষিণ তটে আপনার সৈনিক দল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও, হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ, উভয়কেই আদরসহকারে আহ্বান করিতেন, বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দুর দেবমূর্ত্তি, উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য, অতিথি অভ্যাগত-দিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি, মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ, এই এক এক দিনে বিতরিত হইত। চতুর্থ দিন হইতে, সাধারণ দান-কার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধেরা, দশ দিন হিন্দু দেবতাপূজকেরা এবং দশ দিন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়-বন্ধু-শূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে ৭৫ দিন

পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই বহুমূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া, মহারাজ শিলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীরস্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষ-ক্ষেত্রে আজ আমি, সমুদয় দান করিয়া, নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য-সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপে দান করিবার জন্য, আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসব সমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য রক্ষা ও বিদ্রোহদমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

পবিত্র প্রয়াগে, পবিত্র-স্বভাব চীনদেশীয় শ্রমণ হিউএন্ থ্সঙ্গ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া, ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ, আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ ও অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া, বিবেচনা করিতেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ ভূপতি ধর্ম্ম-সঞ্চয়মানসে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু উহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইঁহাদিগকে সকল সময়ে ঐ উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে কোন রূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধেরা, সর্ব্বদা রাজ্যের

মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। ঐ উৎসবে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ, উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত। উভয়ই, সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্য ইহাঁরা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশল কামনা করিতেন, এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায়নির্দ্ধারণে, সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এদিকে, সাধারণেও এই অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া,রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া ভক্তি করিত। এই রূপে রাজা, সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন। অধিকন্তু, যে সকল সাহসী দস্যু, রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষ রাজ-সিংহাসন গ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাব দেখিয়া, আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসবে, আর্য্যকীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়।

উদ্ভিদতত্ত্ব।

উদ্ভিদ জাতিতে, বিশ্বপতির আশ্চর্য্য কৌশল ও অসীম মহিমার চিহ্ন দেখা যায়। উদ্ভিদবেত্তা পণ্ডিতগণের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে উদ্ভিদের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। স্থিরচিত্তে এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে, বড় আমোদ জন্মে।

জীব-সমূহের যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, উদ্ভিদেও সেইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্যনির্ব্বাহক পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উদ্ভি-

দের দেহ কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম তন্তুতে নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল তন্তু, কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম কোষের সমষ্টি মাত্র। এজন্য পণ্ডিতগণ উহাকে কৌষিক তন্তু নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ লক্ষ লক্ষ কৌষিক তন্তু একত্র হইয়া, উদ্ভিদের মজ্জা, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি সংগঠিত করে। উদ্ভিদের বীজ উপযুক্ত ভূমিতে উপ্ত হইলে এবং উপযুক্ত তাপ ও জল পাইলে উহার অভ্যন্তরস্থ কৌষিক ত্বক্ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া বীজটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। ঐ দুই ভাগের সন্ধিস্থল হইতে, দুইটি অঙ্গ বাহির হয়। উহার একটি বৃক্ষের মূল ও অপরটি বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, অগ্রে প্রথমটি বহির্গত হয়; উহা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলে, দ্বিতীয়টি স্কন্ধ, শাখা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া উঠে।

অনেকের বিশ্বাস, উদ্ভিদের চেতনা নাই। কিন্তু পণ্ডিত-গণের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে এখন এই বিশ্বাস দূর হইয়াছে। জন্তুগণ যেমন আপনাদের অবস্থার উপযোগী খাদ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, উদ্ভিদও সেইরূপ আপনার অবস্থানুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বিশ্বকর্ত্তার আশ্চর্য্য কৌশলে বৃক্ষ সকল বুদ্ধিমান্ পুরুষের ন্যায় আপনার ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া, অসার ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার ভাগ গ্রহণ করিয়া, জীবিত রহে। রস, তাপ ও আলোক, উদ্ভিদের জীবনরক্ষার প্রধান অবলম্বন। সুতরাং উদ্ভিদ উহা, পর্য্যাপ্তপরিমাণে লাভ করিয়া জীবিত থাকিবার জন্য, বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। কোন বৃক্ষের মূলদেশের এক পার্শ্বে সারহীন ও অপর পার্শ্বে সারযুক্ত মৃত্তিকা থাকিলে, সেই বৃক্ষের শিকড় সকল সারহীন পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া, সারযুক্ত মৃত্তিকার অভিমুখে যায়। কোন বৃক্ষের শাখা অধোমুখ করিয়া রাখিলে, উহার অগ্রভাগ

পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধমুখ হয়। গৃহমধ্যে ক্ষুদ্র বৃক্ষ রাখিলে, উহার অগ্রভাগ রৌদ্র পাইবার জন্য, গবাক্ষের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রকারেও উদ্ভিদ-বিশেষের গতিশক্তি ও চেতনা দেখা গিয়া থাকে। লজ্জাবতী লতা ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। স্পর্শ করিবামাত্র এই লতার পত্রসকল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বন-চণ্ডালিকা (বন-চাঁড়াল) নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে। দিবাভাগে মেঘ না থাকিলে, এই বৃক্ষের পত্র সকল আপনা হইতেই ঘূরিতে থাকে। মনুষ্য, যেরূপ অধিকপরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে, সংজ্ঞাশূন্য ও স্থলবিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, লজ্জাবতী লতাও সেইরূপ অহিফেনসংস্পর্শে অচেতন ও বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। এই লতার মূলে অহিফেন-মিশ্রিত জল দিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উহা চেতনাশূন্য হয়; বহুক্ষণ রৌদ্রাদির উত্তাপ পাইলেও উহার পত্র বিকশিত হয় না। অহিফেনের জল দুই দিবস ক্রমাগত সেচন করিলে, এই লতা মরিয়া যায়। ক্লোরোফরম্ নামে এক প্রকার ঔষধ আছে, উহার ঘ্রাণে মানুষ চেতনাশূন্য হয়। লজ্জাবতী লতাতেও এই ক্লোরোফরমের কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই লতার এক পার্শ্বে ঐ ঔষধের বাষ্প লাগাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ সুপ্ত হয়, অপর পার্শ্ব সতেজ ও জাগ্রৎ থাকে।

জীবগণ যেমন, আপন আপন দেহরক্ষার জন্য, যত্নবান্ হয়, উদ্ভিদগণও, তেমন আপনাদিগকে রক্ষা করিতে নিয়ত যত্ন করিয়া থাকে। বৃক্ষ সকল পর্য্যাপ্তপরিমাণে আলোকলাভের নিমিত্ত কিরূপ ব্যগ্র হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। যদি কখনও কোন ক্ষুদ্র তরু অন্ধকারাবৃত কোন ঝোপের অভ্যন্তরে জন্মে, তাহা হইলে, উহা আলোকলাভের নিমিত্ত, আপনার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য-কেও অতিক্রম করিয়া থাকে। আলোক পাইলে, বৃক্ষের পত্র

সকল হরিদ্বর্ণ হয় ; আলোকের অভাবে উহা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়ে। সচরাচর দেখা যায়, কালিকাসুন্দা প্রভৃতির পত্রসমূহ দিবালোকে বিকশিত ও সায়ংকালে মুদ্রিত হয়। যদি কখনও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলেও, ঐ সকল বৃক্ষের পত্র মুদ্রিত দেখা যায়।

উত্তরকারোলাইনা দেশের মক্ষিকাজাল অথবা মক্ষিকাপাশ-নামক বৃক্ষবিশেষে অঙ্গসঞ্চালন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের পত্র-সমূহের উভয় পার্শ্বে এক একশ্রেণী কণ্টক আছে। পত্রের ঊর্দ্ধ পৃষ্ঠে এক প্রকার মিষ্ট রস জন্মে। মক্ষিকাগণ ঐ রস-লোভে, পত্রের উপর বসিলেই, পত্রটি মুদ্রিত হয়। যাবৎ নিবদ্ধ কীট বিনষ্ট না হয়, তাবৎ উহা পুনঃপ্রস্ফুটিত হয় না।

এক প্রকার সামুদ্রিক শৈবাল আছে। উহার সমস্ত দেহ, আপনা হইতেই ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। অপর কতকগুলি শৈবাল স্বেচ্ছা-বিহারী। এ গুলি কোন জলপূর্ণ পাত্রে রাখিলে, পাত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গমন করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই গতি সূক্ষ্মরূপে দৃষ্ট হয়। অনেক পুষ্পও, এইরূপ গতিশক্তি বিশিষ্ট। ঝুম্‌কা পুষ্প ও ফণিমনসা জাতীয় পুষ্পের গর্ভকেশর ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। আমেরিকা দেশে এক প্রকার আগাছা জন্মে, স্পর্শ করিলে, উহার পত্র তৎক্ষণাৎ মুদ্রিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এরূপ অনেক বৃক্ষ আছে যে, তৎসমুদয় রাত্রিকালে মুদ্রিত হয় এবং দিবসে বিকশিত হইয়া থাকে। অনেক পুষ্পও এইরূপ মুদ্রিত ও বিকশিত হয়। লোকে এই মুদ্রণকে বৃক্ষের নিদ্রা এবং বিকাশকে বৃক্ষের চেতনা বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

উদ্ভিদের যেরূপ চেতনা ও অঙ্গ-চালনার ক্ষমতা আছে, সেই রূপ উহাদের অঙ্গে অসাধারণ শক্তিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

উদ্ভিদের এই শক্তির বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বড় বিস্ময় জন্মে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উদ্ভিদের বীজ হইতে দুইটি অঙ্গ বাহির হয়, উহার একটি মৃত্তিকার ভিতরে যাইয়া, মূলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই মূল দ্বারা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া, উদ্ভিদ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। কোনরূপ বাধা উপস্থিত হইলেও উদ্ভিদ আপনার পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন জন্য যথাশক্তি যত্ন করিয়া থাকে। এজন্য উহারা অভাবনীয় শক্তি বিকাশ করিতেও কাতর হয় না। সচরাচর দেখা যায়, অতি কোমল নবাঙ্কুর অতি কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উপরে উঠে। সদ্যঃপ্রসুত বংশাঙ্কুর এরূপ কোমল হয় যে, ক্ষীণশক্তি বালকও, অনায়াসে উহা ভাঙ্গিতে পারে। কিন্তু এই সুকোমল অঙ্কুরের শিরোদেশে একটি হাঁড়ী বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখ, দেখিতে পাইবে, সেই বংশাঙ্কুর হাঁড়ীটি মস্তকে করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। যদি হাঁড়ী মৃত্তিকায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলেও কোমল বংশাঙ্কুর উহা ভেদ করিয়া, ঊর্দ্ধাভিমুখ হয়। হাঁড়ীর প্রতিকূলতায় অঙ্কুরের পরিবর্দ্ধন কোনও ক্রমে ব্যাহত হয় না।

সকলেই গিলে ও নাটাফল, তাল ও আম্রের বীজ দেখিয়াছেন। ঐ বীজ যে, কত দৃঢ় এবং কত আয়াসে যে, উহা ভেদ করা যায়, তাহাও সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সুকোমল নবাঙ্কুর ঐ কঠিন আবরণও অবলীলায় ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখ হয়। এইরূপে অঙ্কুরোদ্গম সময়ে বীজস্থ কোমল কৌষিক ত্বক্ অসাধারণ শক্তির কার্য্য করিয়া থাকে।

রাত্রিকালে কোন কোন উদ্ভিদ হইতে আলোক নির্গত হইয়া থাকে। অনেকেই উদ্ভিদ বিশেষের এই আশ্চর্য্য ধর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ড্রমণ্ড নামক একজন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন

যে, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে স্বান নদীর দীরে এক প্রকার ছত্রক, (বেঙ্গের ছাতা) তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল। রাত্রিতে এই ছত্রক এরূপ উজ্জ্বল আলোক-মালায় শোভিত হইত যে, তিনি সেই আলোকের সাহায্যে অনায়াসে পুস্তক পাঠ করিতেন। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে এক প্রকার ছত্রক আছে; রাত্রিকালে উহা হইতে খদ্যোতের আলোকের ন্যায় ঈষৎ হরিদ্বর্ণ জ্যোতিঃ নির্গত হয়। কয়েক প্রকার গেঁদা পুষ্পও সন্ধ্যার সময় উজ্জ্বল বোধ হইয়া থাকে।

দেশভেদে উদ্ভিদের বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে, তৎসমুদয় হিমমণ্ডলে উৎপন্ন হয় না, এবং হিমমণ্ডলের উদ্ভিদও সমমণ্ডলের শোভা বিকাশ করে না। গ্রীষ্মমণ্ডল উদ্ভিদসমূহের প্রধান উৎপত্তি-ক্ষেত্র। এই মণ্ডলে ধান্য, ইক্ষু, আম্র, খর্জ্জুর, দারুচিনি, প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই ভূখণ্ডের কোন কোন বৃক্ষ, সুমধুর ফল দিয়া মানবের রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছে, কোন কোন বৃক্ষ, সুশীতল ও সুপেয় জল দিয়া তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ ও পরিতুষ্ট করিতেছে, কোন কোন বৃক্ষ, নেত্র-তৃপ্তিকর কুসুম-রাজিতে অলঙ্কৃত হইয়া, বন-ভূমির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, এবং কোন কোন বৃক্ষ নিরন্ন ব্যক্তির জীবনরক্ষার প্রধান সম্বল হইয়া, অনুপম শক্তি প্রকাশ করিতেছে। এক্ষণে মানবের যত্ন ও পরিশ্রমবলে এক মণ্ডলের বৃক্ষ মণ্ডলান্তরে উৎপন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু সেই সেই মণ্ডল, পরিশ্রমোৎপন্ন বৃক্ষ সমূহের স্বাভাবিক আবাস-ভূমি নহে। দেশ ভেদে উদ্ভিদভেদ হওয়াতে, মনুষ্যের খাদ্য দ্রব্যাদিরও পার্থক্য লক্ষিত হয়। রাই নামক শস্য, সুমেরুমণ্ডলবাসী মানবগণের প্রধান খাদ্য দ্রব্য; তথায় ধান্যের উৎপত্তি হয় না। গোধূম, সুমেরু, মণ্ডলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিগণের জীবনরক্ষার

অবলম্বন। উহার দক্ষিণে ধান্যের উদ্ভব-ক্ষেত্র। এই ধান্যের সহিত ইক্ষু, নারিকেল, খর্জ্জূর প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আলোক, উদ্ভিদগণের দেহরক্ষার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু অনেক উদ্ভিদ অন্ধকারময় খনির অভ্যন্তরে জন্মে। এই স্থানে ঐ সকল উদ্ভিদ তাদৃশ আলোক প্রাপ্ত হয় না। সমুদ্র ও নদীর গর্ভে, যে সকল শৈবালের উৎপত্তি হয়, তৎসমুদয় আলোক পাইয়া থাকে। সমুদ্রশৈবাল, দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর অনেক উন্নত বৃক্ষকেও পরাজিত করিয়া থাকে। এইরূপ শৈবালে প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক স্থান পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। জলের অভাবে উদ্ভিদসমূহ কখনও সজীব থাকে না। আলোক যেরূপ স্থলবিশেষে উদ্ভিদের জীবনরক্ষার গৌণ অবলম্বন, জল সেরূপ নহে। জলের অভাব হইলে, উদ্ভিদ কোনও কালে কোনও অবস্থায়, জীবিত থাকে না। এই জন্যই, জলশূন্য মরুপ্রান্তরে বৃক্ষলতাদির অভাব দেখা যায়।

সুচরিত্র।

সুচরিত্র একটি বহুমূল্য সম্পত্তি। অন্য কোন পার্থিব সম্পত্তির সহিত উহার তুলনা হয় না। সংসারে সুচরিত্র, মানুষকে উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়া থাকে। পরিশ্রমী, সত্যবাদী, উদারচেতা এবং সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট ও সাধু ভাবসম্পন্ন মানব, সমাজের সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিরূঢ় থাকিয়া, সাধারণের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া থাকেন। সকলেই তাঁহাকে বিশ্বাস করে, এবং সকলেই তাঁহার অনুকরণে ব্যগ্র হয়। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, সুখপ্রদ ও উৎকৃষ্ট, তিনি তাহারই অধিকারী হন। তাঁহার অবর্ত্তমানে পৃথিবী অসার ও অপদার্থ হইয়া পড়ে। এই পরিশ্রম, সত্য-বাদিতা, সাধুতা, উদারতা ও সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ, চরিত্রগুণেই বর্দ্ধিত হয়।

প্রতিভাশালী ব্যক্তি, লোকের নিকট কেবল প্রশংসা প্রাপ্ত হন। সচ্চরিত্র ব্যক্তি, প্রশংসার সহিত, সমাদর ও সম্মান এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া থাকেন। প্রতিভা, মস্তিষ্কের শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়; সুচরিত্র, হৃদয়ের শক্তি বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। যাহার হৃদয় যে ভাবে পূর্ণ হয়, সে, সংসারে তদনুরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, জীবন অতিবাহিত করে। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যখন সমাজে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনে সযত্ন হন, চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি, তখন সমাজে ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষসাধনে সচেষ্ট থাকেন। সমাজ, একজনের সুখ্যাতি করে, অপর জনের অনুকরণে ব্যগ্র থাকে।

মহৎ ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে

অতি অল্প লোকই মহত্ত্ব লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্ষমতানুসারে, সাধুতা ও সম্মানের সহিত আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারেন। দয়াময় ঈশ্বর, তাঁহাকে যে সমস্ত বিষয় দিয়াছেন, তিনি, তৎসমুদয়ের যথাযোগ্য ব্যবহারে সমর্থ হইতে পারেন। তিনি, তাঁহার জীবন সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে পারেন এবং সত্যবাদী, সাধু, বিশ্বাসী ও সুব্যবস্থিত হইতে পারেন। সংক্ষেপে তিনি, যে অবস্থায় রহিয়াছেন, সেই অবস্থায় থাকিয়াই, স্বকর্ত্তব্যের সম্পাদন করিতে পারেন।

কেবল জ্ঞানানুশীলনের সহিত চরিত্রের পবিত্রতার তাদৃশ নিকট সম্বন্ধ নাই। তাই বলিয়া, বিদ্যাচর্চ্চায় অবহেলা করা বিধেয় নহে। বিদ্যার সহিত সাধুতার সংযোগ থাকা আবশ্যক। কোন কোন সময়ে, বিদ্যার সহিত অপকৃষ্ট চরিত্রের সম্মিলন দৃষ্ট হয়। এক ব্যক্তি, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে সুপণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু সাধুতা, ধর্ম্মশীলতা, সত্যবাদিতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায়, তিনি, নিরক্ষর ও দরিদ্র কৃষকগণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কোন সুপণ্ডিত ও সুলেখক কহিয়াছেন, "আমি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি, অনেক জ্ঞানী লোক দেখিয়াছি, অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু অশিক্ষিত পুরুষ ও রমণীগণ, আমার নিকট যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা পুস্তকাদির মত অপেক্ষাও উচ্চতর।" আমরা, যাবৎ সমুদয় পদার্থই, চন্দ্রালোকের ন্যায় নির্ম্মল দেখিতে অভ্যাস না করিব, তাবৎ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধন করিতে সমর্থ হইব না।

বিদ্যা অপেক্ষা ধনের সহিত চরিত্রের উন্নতির দূরতর সম্বন্ধ। ধন, অনেক সময়ে চরিত্র দূষিত ও অপকৃষ্ট করিয়া থাকে। অর্থ, ভোগাসক্তি, অপকর্ষ ও পাপ, পরস্পর ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ। অর্থ,

যদি হীনবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির হস্তে পতিত হয় তাহা হইলে উহা নানা অনর্থের মূল হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে দরিদ্রাবস্থার সহিত চরিত্রের অপেক্ষাকৃত নিকট সম্বন্ধ আছে। লোকে নিজের পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা ও সদাচারের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখাইতে সক্ষম হয়। কোন জ্ঞানী লোক, তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন :—"যদিও তোমার একটি কপর্দ্দকও সম্বল নাই, তথাপি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে বিমুখ হইও না। যেহেতু, হৃদয় সাধু ও মনুষ্যোচিত না হইলে, কেহই সম্মানিত হয় না।" এক ব্যক্তি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, আপনার পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি, যদিও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই, তথাপি বিলক্ষণ জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁহার পুস্তকালয়ে একখানি ধর্ম্মপুস্তক ও কয়েকখানি সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাঁহার আয়ও যৎসামান্য ছিল। এই সদাশয় ব্যক্তি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সৎপ্রকৃতি ও সদ্ব্যবহারের বলে এরূপ খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন, যে, তাহা, অনেক ধনবান্ ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

চেষ্টা ব্যতিরেকে চরিত্র উন্নত ও উচ্চভাবে পূর্ণ হয় না। চরিত্রের উন্নতি জন্য, আত্মশাসন থাকা আবশ্যক। পৃথিবীর চারি দিকেই, পাপ লোকের অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, চারি দিকেই, প্রলোভনসামগ্রী বিস্তৃত আছে। এই পাপ ও প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, চরিত্র উন্নত করিতে হইলে, আত্মশাসনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। যাহা পাপজনক ও যাহা অকর্ত্তব্য, তাহা চিরকাল ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করা উচিত। আত্মশাসন না থাকিলে, পাপ হইতে দূরে থাকিয়া, সৎপথ অবলম্বন করা যায় না। আত্মশাসন সকল ধর্ম্মের মূল। আত্মশাসনে

ক্ষমতা না থাকিলে, মানুষ প্রায়ই কুপথে পদার্পণ করিয়া চরিত্র দূষিত করে। যখন কোন অকার্য্যের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা জন্মে, তখন আত্মশাসনবলে সেই ইচ্ছা সংযত করা কর্ত্তব্য। বাল্যশিক্ষা ও সৎসংসর্গের উপর চরিত্রের উন্নতি ও অবনতি, অধিকাংশে নির্ভর করে। আত্মশাসন দ্বারা আপনাকে অসৎবিষয়ের শিক্ষা ও অসৎ সংসর্গ হইতে বিরত রাখা বিধেয়।

আত্মশাসনের সহিত সুশিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তের সংযোগ থাকা উচিত। সুশিক্ষায় অন্তঃকরণ মার্জ্জিত হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়, এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান অটল হইয়া থাকে। সদ্দৃষ্টান্তেও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা জন্মে। চরিত্র, ক্রমে সুশিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তে, উন্নত ও পবিত্র হইয়া উঠে।

ভারতে ভারতীর অপূর্ব্ব পূজা।

নালন্দায় বেদমাতা ভারতীর পূজা, ভারতের একটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। নালন্দা গয়ার নিকটবর্ত্তী। কেহ কেহ বর্ত্তমান বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে একটি আম্রকানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক্, উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ, ঐ আম্রকাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ ভূপতিগণের দানশীলতায়, ক্রমে এই বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দার

বিদ্যামন্দির, এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে, সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ বিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ, এই স্থানে থাকিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহাবিদ্যালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারিতল অট্টালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য, একশতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পরসম্মিলনের জন্য, মধ্যস্থানে অনেকগুলি বড় বড় গৃহ সুসজ্জিত থাকিত। মহারাজ শিলাদিত্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। নগরের কোলাহল ঐ স্থানের শান্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলোভন, উহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ ঐ পবিত্র শান্তিনিকেতনে, প্রশান্তভাবে শাস্ত্র-চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার পবিত্র বিদ্যালয় কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যেও উহা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং উহার শিক্ষার্থিগণ শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রচিন্তায় প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রই ইঁহার আয়ত্ত ছিল। অসাধারণ ধর্ম্মপরতায়, অসাধারণ দূরদর্শিতায় ও অসাধারণ অভিজ্ঞতায়, এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ নালন্দার পবিত্র বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

চীনের প্রসিদ্ধ পর্য্যটক হিউএন্ থ্‌সঙ্গ্ এই সময়ে ভারতবর্ষে

আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতীর ঐ লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হন। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ বিনয়ের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক নালন্দায় আসিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে, দুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ আপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথিকে যথোচিত অভ্যর্থনাসহকারে গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ, কেহ ছাতা ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ বা গম্ভীরস্বরে অতিথির প্রশংসা-গীতি গাহিয়া, তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। শীলভদ্র বেদীতে বসিয়াছিলেন, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ বেদীর সম্মুখে আসিয়া, বিনয়নম্রতার সহিত বর্ষীয়ান্ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্ থ্সঙ্গ্ শীলভদ্রের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। যিনি চীনসাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ববিৎ বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, দেশে বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া, নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণে, যাঁহার লোকাতীত জ্ঞানগরিমার নিকট অবনতমস্তক হইত, তিনি জ্ঞানসঞ্চয়মানসে ভারতীর এই পবিত্র লীলা-ভূমিতে ভারতের অভিজ্ঞ পুরুষের শিষ্য হইলেন। বিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট গৃহে হিউএন্ থ্সঙ্গকে স্থান দেওয়া হইল। দশ জন লোক তাঁহার অনুচর ও দুইজন শ্রমণ, নিয়ত তাঁহার শুশ্রূষার্থ নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ শিলাদিত্য তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয়নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ সকলের আদরণীয় হইয়া, পাঁচ বৎসর নালন্দার বিদ্যালয়ে ছিলেন। পাঁচ বৎসর, মহাপ্রজ্ঞ শীলভদ্রের পদতলে বসিয়া, পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদিগের সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এখন এই পবিত্র বিদ্যামন্দিরের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই।

কালের কঠোর আক্রমণে, ভারতীর এই লীলাভূমি এখন ভগ্ন দশায় পতিত রহিয়াছে।

ইতর প্রাণীদিগের মনোবৃত্তি।

মানবগণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বলে ইতর প্রাণিগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির গুণে, তাহারা বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বের নির্ণয় করিতেছে, হিতাহিত বিবেচনা করিয়া, কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেছে, এবং হিতৈষিতা ও ন্যায়পরতা, দেখাইয়া, ভূমণ্ডলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। যে গুণে, মানব ভূমণ্ডলে এইরূপ শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হইয়াছে, ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও, কিয়দংশে সেই গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক সময়ে ইতর প্রাণিগণ, মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া, সকলকে চমৎকৃত করে। যে হিতৈষিতা, কোমলতা ও উদারতা মানব জাতির প্রধান ভূষণ, পশুজাতিতেও সেই হিতৈষিতা, কোমলতা ও উদারতার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

বানরদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনার সম্বন্ধে অনেক কথা জনসমাজে প্রচলিত আছে। এই বাকৃশক্তিশূন্য জীবগণ, বুদ্ধিবৃত্তির বলে, অনেক সময়ে, সাধারণ মনুষ্যদিগকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার একজন ভ্রমণকারী স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়াছেন, একদা একদল বানর, একটি ক্ষুদ্র সরিৎ উত্তীর্ণ হইবার জন্য, নদীকূলে উপস্থিত হয়। নদীর উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল। বানরদল ঐ বৃক্ষদ্বয় অবলম্বন করিয়া, পার হইবার এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন

করে। ইহাদের একটি প্রথমে তটদেশের বৃক্ষে উঠিল এবং উহার অগ্রবর্ত্তী শাখা পদদ্বয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া, আপনার দেহ প্রসারিত করিল, পরে আর একটি বানর, প্রথমটির দুই হস্ত আপনার পদদ্বয়ে দৃঢ়রূপে ধরিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় দেহ বিস্তার করিল ; এইরূপে কতকগুলি বানর, ক্রমান্বয়ে পরস্পরের হস্ত ও পদ আবদ্ধ করিয়া, নদীর অপর তটস্থ বৃক্ষের শাখা ধারণ করিল। অবশিষ্ট বানরগুলি স্বজাতির দেহনির্ম্মিত এই অপূর্ব্ব সেতুদ্বারা অপর তীরে উপস্থিত হইল। পরে, যে বানরগুলি আপনাদের দেহ প্রসারণ পূর্ব্বক সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা পর্য্যায়ক্রমে এক একটি করিয়া, তটবর্ত্তী সঙ্গীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। বানরদিগের এই অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বার বার প্রশংসা করিতে হয়। রেঙ্গার নামক একজন প্রাণিবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিত, বানরদিগের মানসিক বৃত্তির প্রখরতার সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, ইতর প্রাণিগণও প্রগাঢ় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। রেঙ্গার, তাঁহার গৃহপালিত বানরদিগকে কাগজের মোড়কে করিয়া মিছ্রি দিতেন। একদা তিনি মিছ্রির পরিবর্ত্তে পূর্ব্বের ন্যায় কাগজের মোড়কে করিয়া, একটি সজীব বোলতা, একটি বানরের হস্তে সমর্পণ করেন। বানর, মিছ্রি মনে করিয়া, যেমন সেই মোড়ক খুলিয়াছে, অমনি বোলতা তাহার গাত্রে দংশন করে। এই ঘটনার পর, রেঙ্গার যতবার খাদ্য সামগ্রী পূর্ব্ববৎ কাগজের মোড়কে আবদ্ধ করিয়া, সেই বানরকে দিয়াছেন, বানর ততবার উহা সাবধানে হাত দিয়া তুলিয়াছে, সাবধানে কর্ণের নিকট লইয়া, উহার শব্দ পরীক্ষা করিয়াছে, এবং সাবধানে মোড়ক খুলিয়া, খাদ্য সামগ্রী বাহির করিয়া লইয়াছে। বানরদিগের অনুচিকীর্ষা ও কুতূহলপরতাও, বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় বলবতী। একদা

একটি বানর একজনকে প্রাতঃকালে দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিতে দেখিয়া, আপনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে দন্তধাবন করিত। ব্রেম নামক একজন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, এক সময়ে তাঁহার কতকগুলি পালিত বানর ছিল। উহারা সর্প দেখিলে যারপরনাই ভীত হইত। এই প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের গৃহে বাক্সবদ্ধ কতকগুলি সর্পও ছিল। বানরগণ যদিও সর্পদর্শনে সন্ত্রস্ত হইত, তথাপি কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, সময়ে সময়ে ঐ বাক্সের ডালা খুলিয়া সর্পগুলিকে অভিনিবেশসহকারে দেখিত। প্রসিদ্ধ প্রাণিবিদ্যাবিশারদ ডারউইন্ সাহেব একদা লণ্ডন নগরের পশুশালাস্থিত কতকগুলি বানরের সম্মুখে, একটি মৃত সর্প নিক্ষেপ করেন। সর্পদর্শনে ভীত হইয়া, বানরগণ প্রথমে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল, কিন্তু পরে যখন জানিতে পারিল, নিক্ষিপ্ত সর্প সজীব নহে, তখন তাহারা একে একে সর্পের নিকটবর্ত্তী হইল এবং আগ্রহের সহিত সর্পের সমস্ত দেহ দেখিয়া, আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিল। অনেক স্থলে বানরগণ, মানুষের কার্য্যকলাপের এরূপ সুন্দর অনুকরণ করে যে, তাহা হঠাৎ দেখিলে সাতিশয় বিস্মিত হইতে হয়। স্ত্রাবো নামক গ্রীশ দেশের এক জন ইতিহাসবেত্তা এবিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মাসিদনের মহাবীর সেকন্দর শাহ, যখন সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন একদা বহুসংখ্য বানর বন হইতে বাহির হইয়া, সেই মাসিদনীয় সৈন্যের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হয়। যুদ্ধসজ্জিত ও শত্রুসম্মুখীন সৈন্যের অবস্থানের সহিত, তাহাদের অবস্থানের অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। ইহাতে সেকন্দর শাহের সৈন্যগণের এমন মতিভ্রম হয় যে, তাহারা প্রকৃত শত্রুসেনা ভাবিয়া, ঐ দলবদ্ধ বানরদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্‌যোগ করে।

উপস্থিত বুদ্ধি ও কৃতজ্ঞতাপ্রভৃতি গুণে, হস্তী এবং কুক্কুরও বিশেষ প্রসিদ্ধ। একদা একজন মৃগয়ার্থী, আপনার হাতীতে চড়িয়া, অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। বনে প্রবেশ করিবার পরেই, একটি সিংহ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। শিকারী, অসাবধানতা প্রযুক্ত, হঠাৎ হস্তীর পৃষ্ঠদেশ হইতে ভূপতিত হইয়া, পশুরাজের ক্ষমতায়ত্ত হন। হস্তী, প্রভুর এই আকস্মিক বিপদদর্শনে কর্ত্তব্য-বিমুখ হয় নাই। সে, প্রত্যুৎপন্ন মতিপ্রভাবে, সমীপবর্ত্তী একটি বৃক্ষের কাণ্ড অবনত করিয়া, এমন দৃঢ়তর বলে, সিংহের পৃষ্ঠদেশে চাপিয়া ধরে যে, সিংহ, তাহাতেই শিকারীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিয়া, গতাসু হয়। মৃগয়াসময়ে, কুক্কুরগণও এইরূপ প্রত্যুৎপন্ন মতি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। একদা, একজন শিকারী, নদীর এক তটে থাকিয়া, অপর তটের দুইটি হংসের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন। ইহাতে দুইটি হংসেরই পক্ষদেশে গুলি প্রবেশ করে। শিকারী, এই হংসদ্বয়কে আনিবার জন্য, স্বীয় কুক্কুরকে ইঙ্গিত করেন। কুক্কুর, প্রভুর আদেশপ্রতিপালনার্থ সন্তরণ দ্বারা, অপর তটে উপনীত হইয়া, একবারে দুইটি হংসকেই এক সঙ্গে আনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, একটি রাখিয়া, আর একটিকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়। পাছে, তাহার অনুপস্থিতিতে আহত হংস পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় দুইটিকে একবারে বধ করিয়া, ক্রমান্বয়ে দুই বার নদী উত্তীর্ণ হইয়া, এক একটিকে প্রভুর নিকট আনিয়া দেয়।

টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণসময়ে, একটি হস্তী, যেরূপ কৌশলে একজন সৈনিক পুরুষকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, হস্তিজাতির পরিণাম-দর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার যারপরনাই প্রশংসা করিতে হয়।

ইঙ্গরেজসেনা, যখন টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে, তখন কতকগুলি তোপ, একটি বিশুষ্ক নদীর বালুকাময় গর্ভ দিয়া, নগরাভিমুখে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এই তোপসমূহের একটির উপর একজন সৈনিক পুরুষ বসিয়াছিল। ঘটনাক্রমে উপবিষ্ট সৈনিক, হঠাৎ এমন ভাবে পড়িয়া গেল যে, কিয়ৎক্ষণমধ্যেই তোপের চক্র, তাহার দেহের উপর দিয়া যাইত। পশ্চাতে একটি হস্তী আসিতেছিল, সহসা এই ভয়ানক ব্যাপার, তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। বিচক্ষণ হস্তী, কালবিলম্ব না করিয়া, শুণ্ড দ্বারা তোপের চক্র উত্তোলিত করিল, এবং উহা অধঃপতিত সৈনিককে অতিক্রম করিলে, পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে মাটিতে নামাইয়া দিল। হস্তী কামানটি তুলিয়া না ধরিলে, চক্রপেষণে সৈনিক পুরুষের মৃত্যু হইত।

অশ্বজাতির মনোবৃত্তিও সাতিশয় বলবতী। বোডিলিয়ে নামক একজন সেনাপতির একটি অশ্ব ছিল। অশ্বটি সুশ্রী ছিল বটে, কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তাহার দন্ত সকল ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছিল, এজন্য ঘাস বা দানা চর্ব্বণ করিতে পারিত না। স্বজাতীয়ের এই দুঃসময়ে, পার্শ্বস্থিত অপর দুইটি অশ্ব ঘাস ও দানা চর্ব্বণ করিয়া, বৃদ্ধ অশ্বের সম্মুখে ফেলিয়া দিত। বৃদ্ধ অশ্ব, এই চর্ব্বিত ঘাস ও চূর্ণ চনক ভোজন করিয়া কিছুকাল জীবিত ছিল। পনি ঘোটকের স্মৃতিশক্তির সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইঙ্গলণ্ডের কোন সংবাদ-পত্র-বণ্টনকারীর একটি পনি ছিল। সে, সংবাদপত্রের সমুদয় গ্রাহককেই উত্তমরূপে চিনিত। বণ্টনকারীর পীড়া হইলে, একটি বালককে ঐ পনির উপর আরোহিত করিয়া, সংবাদপত্র বণ্টন করিতে, পাঠান হয়। এই সময়ে সুযোগ্য ঘোটক, প্রত্যেক গ্রাহকের দ্বারদেশে

থামিয়া সংবাদপত্র বিলি করিয়া দিয়াছিল। ইহাতে আরোহীর কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা হয় নাই।

কয়েক বৎসর হইল, ফরাসী ও প্রুশীয়দিগের মধ্যে, যে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই সংগ্রামসময়ে সুশিক্ষিত পক্ষীজাতি অসামান্য বুদ্ধি-চাতুরী প্রদর্শন করে। শত্রুসেনায় পারী নগরী অবরুদ্ধ হইলে,ফরাসীগণ সুশিক্ষিত কপোতের মুখে পত্র দিয়া ছাড়িয়া দিত, পত্রবাহক কপোত, আকাশপথে উড্ডীয়মান হইয়া, ঐ পত্র যথাস্থানে লইয়া যাইত। একদা ফরাসীগণ, এইরূপ একটি কপোত ছাড়িয়া দিয়াছিল, এমন সময়ে বিপক্ষগণ, ঐ কপোতবাহিত পত্র হস্তগত করিবার জন্য, একটি শ্যেন পক্ষীকে ছাড়িয়া দিল। শ্যেন উড্ডীন হইয়া, পত্রবাহক কপোতকে আক্রমণ করিল। বুদ্ধিমান, প্রতিপালক-হিতৈষী কপোত দেখিল, পত্ররক্ষার আর কোন উপায় নাই, সুতরাং সে কালবিলম্ব না করিয়া, পত্রখানি গিলিয়া ফেলিল। কিন্তু ইহাতে কপোত পরিত্রাণ পাইল না। শ্যেনের আক্রমণে তাহার ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত ও জীবন বিনষ্ট হইল। পরিশেষে কপোতের গলদেশ ছিন্ন করিয়া পত্র বাহির করা হইল। একটি সদাশয়া ফরাসীমহিলা, এই হিতৈষী কপোতের বিবরণ মধুর গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া, উহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন।

বানরজাতির উপস্থিত বুদ্ধির সম্বন্ধে পূর্ব্বে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এই স্থলে বানরের হিতৈষিতা, সুকৌশল ও বুদ্ধির আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এই দৃষ্টান্ত ভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে, আমাদের দেশেই এই বিষয় ঘটিয়াছিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে, লোকের দ্বারে দ্বারে বানর নাচাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে, রাত্রিকালে, কয়েক-

জন পাপাত্মা, অর্থলোভে নিহত করে, এবং তাহার শব নিকট-বর্ত্তী প্রান্তরে প্রোথিত করিয়া রাখে। নিহত ব্যক্তির প্রতি-পালিত বানর, অন্তরালে থাকিয়া, এই সমস্ত ঘটনা দর্শন করে। রাত্রি প্রভাত হইলে, বানর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, নিকটবর্ত্তী থানায় উপস্থিত হয়, এবং পুলিসের সকল লোককেই সবলে বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। শান্তিরক্ষকগণ বানরের এই অদৃষ্টচর কার্য্যদর্শনে, কৌতূহলী হইয়া, তাহার সঙ্গে যায়। বানর এইরূপে শান্তিরক্ষকদিগকে সঙ্গে লইয়া, নির্দ্দিষ্ট প্রান্তরে উপনীত হয়, এবং যে স্থানে তাহার প্রতিপালনকর্ত্তার শব প্রোথিত ছিল, সেই স্থানে যাইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, হস্তদ্বারা মৃত্তিকা তুলিতে আরম্ভ করে। ইহা দেখিয়া, শান্তিরক্ষকগণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই, শব তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। শান্তিরক্ষকগণ, পরিশেষে এই বানরের সাহায্যেই, হত্যাকারী-দিগকে ধৃত করে।

একজন সম্ভ্রান্ত ইঙ্গ্‌লণ্ডীয় মহিলা একটি কুক্কুটীর কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"আমার ইয়ারিকো নামে একটি কুক্কুটী ছিল। তাহার প্রায় দশ বারটি শাবক হয়। আমি প্রত্যহ, তাহাকে স্বহস্তে আহারীয় সামগ্রী দিতাম। ইয়ারিকো, আহারে পরিতুষ্ট হইয়া, শাবকগণের সহিত পরম সুখে কালাতিপাত করিত। একদা প্রাতঃকালে দেখিলাম, একটি শৃগাল, ইয়ারিকোর সন্তানগুলিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইয়ারিকো পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক শাবকগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া, শৃগালের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইয়ারিকোর সন্নিবেশ-ভঙ্গী ও তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে, স্পষ্টই প্রতীত হইয়াছিল যে, সে, শৃগালের নিকট আত্মসমর্পণ

করিবে, তথাপি প্রাণাধিক সন্তানগুলিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিবে না। আমি এই ঘটনা দেখিবা মাত্র, কালবিলম্ব না করিয়া, আমার কুক্কুরকে ইঙ্গিত করিলাম; কুক্কুর, তৎক্ষণাৎ মহাবেগে ধাবিত হইয়া, ইয়ারিকোকে নিরাপদ করিল। এই অবধি আমি দেখিলাম, ইয়ারিকোর সহিত কুক্কুরের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছে। ইহারা, সর্ব্বদা একসঙ্গে অবস্থান করিত। ইয়ারিকো কুক্কুরের প্রতি এরূপ কৃতজ্ঞ ছিল যে, সে কখনই কুক্কুরকৃত ঐ মহদুপকার বিস্মৃত হয় নাই। ইয়ারিকোর শাবকগুলি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক হইলে, সর্ব্বদা তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা সেই কুক্কুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। এক দিনের জন্যও তাহারা কুক্কুরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করে নাই। তাহাদের মধ্যে যে, প্রগাঢ় সদ্ভাব, অকৃত্রিম প্রীতি ও অবিচলিত স্নেহ আছে, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইত।" এক জন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ইতর জীবদিগের পরোপকার ও স্নেহের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"একদা, এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার আবাসবাটীর প্রাঙ্গণে শকট পরিচালনা করিতেছিলেন; হটাৎ শকটের চক্র তাঁহার পালিত কুক্কুরের পাদদেশের উপর দিয়া চলিয়া গেল। কুক্কুর যাতনায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কুক্কুরের এই কাতরতাদর্শনে নিকটবর্ত্তী একটি কাক, তথায় উপস্থিত হইয়া, কাতরভাবে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই অবধি, কাক, কুক্কুরের আহারের জন্য, প্রতিদিন মাংসখণ্ড আনিয়া দিত। ক্রমে কুক্কুরের চক্রনেমির আঘাত-জনিত ক্ষতস্থান, সাতিশয় উৎকট হইয়া উঠিল; শারীরিক বল ও তেজস্বিতা অন্তর্হিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে মৃত্যুসময় নিকটবর্ত্তী হইল। এই সময়ে কাক, কুক্কুরের আহারান্বেষণ ব্যতীত, আর কোনও কার্য্য উপলক্ষে, স্থানান্তরে যাইত না, সর্ব্বদা বিষণ্ণ চিত্তে, কুক্কুরের নিকট বসিয়া থাকিত।

একদা কাক, আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছে, তাহার আসিতে সন্ধ্যা অতীত হইল, ইত্যবসরে কুক্কুর-রক্ষক, সেই পীড়িত কুক্কুরটিকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া, দ্বার রোধ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। কাক, আসিয়া দেখিল, গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং সে, উপায়ান্তর না দেখিয়া, সমস্ত রাত্রি, চঞ্চুপুটদ্বারা দ্বারের নিম্নস্থ ভূমি খনন করিতে লাগিল। পরহিতৈষী, পরদুঃখকাতর কাকের প্রগাঢ় পরিশ্রমে, ক্রমে দ্বারের নিম্নভাগে একটি গর্ত্ত প্রস্তুত হইল। কাক, ঐ গর্ত্ত দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় কুক্কুররক্ষক তথায় উপস্থিত হইয়া, এই অদৃষ্টচর ও অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনে, যারপরনাই বিস্মিত হইল।

উল্লিখিত উদাহরণ-পরম্পরা, ইতর প্রাণীদিগের মনোবৃত্তির উৎকর্ষের পরিচয় দিতেছে। মানবগণ, যে গুণের প্রভাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, যে গুণের প্রভাবে পবিত্র সুখের রসাস্বাদে সমর্থ হইতেছে, যে গুণ, তাহাদের হৃদয় অতুলনীয় ও অনবদ্য করিয়া তুলিতেছে, সামান্য প্রাণিজাতিতেও, সে গুণ বিরল নহে। হায়! অনেকে সামান্য সুখের আশায়, এই প্রাণীদিগকেও যাতনা দিতে কুণ্ঠিত হয় না, এবং অনেকে সামান্য জীবগণের মধ্যেও, দয়া, ন্যায়পরতা ও হিতৈষিতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইয়াও, গর্হিত কার্য্যসাধনে সঙ্কোচ প্রকাশ করে না। দয়াময় জগদীশ্বর, তাহাদিগকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী করিয়াছেন, তাহারা অবলীলায় ও অসঙ্কোচে তৎসমুদয় নষ্ট করিয়া, ইতর প্রাণিগণ হইতেও ইতর ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে শিক্ষাশূন্য, বাক্‌শক্তিশূন্য সামান্য জীবগণ, ঐ সকল মানবগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই।

অসাধারণ রাজভক্তি।

মিবারের অধিপতি, রাজপুত-কুলগৌরব, পরাক্রান্ত, সংগ্রামসিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। যিনি, সাহসে অবিচলিত ও বীরত্বে অতুল্য ছিলেন, অস্ত্রাঘাতের আশীটি গৌরবসূচক চিহ্ন, যাঁহার দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, যিনি যুদ্ধে ভগ্নপদ ও ছিন্নহস্ত হইয়াও, আপনার বীরত্ব-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ পঞ্চ ভূতে মিশিয়া গিয়াছে। মিবারের অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। তাঁহার শিশু সন্তান, শত্রুর হস্তগত। ভবিষ্যৎ বিপদে অনভিজ্ঞ, ছয় বৎসরের বালক, নিশ্চিন্তমনে আহারপানে পরিতুষ্ট হইতেছে, এ দিকে যে, দুরন্ত শত্রু, তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল ও অনভিজ্ঞ শিশু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। দাসীপুত্র বনবীর* মিবারের সিংহাসন অধিকার করিবার আশায়, এই কোমল কোরকটিকে বৃন্তচ্যুত করিতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। বাপ্পারাওর পবিত্র বংশ নির্ম্মূল করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে। একটি অসহায় রমণী, এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; অনাথ বালক, একটি তেজস্বিনী ধাত্রীর আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতেছে। ধাত্রী পান্না, অশ্রুতপূর্ব্ব রাজভক্তির বলে বাপ্পারাওর বংশধরকে জীবিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছে।

কি উপায়ে পান্না, এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিল, কি উপায়ে

* বনবীর সংগ্রামসিংহের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের পুত্র। একটী দাসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। উদয়সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বনবীরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু বনবীর আপনার রাজ্য অব্যাহত রাখিবার জন্য, উদয় সিংহকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়।

পিতৃহীন শিশু অক্ষতশরীরে রহিল, তাহা শুনিলে, হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে, উদয়সিংহ আহার করিয়া, নিদ্রিত রহিয়াছে, এমন সময়ে একজন নাপিত * আসিয়া, ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ধাত্রী, তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারীর মধ্যে, নিদ্রিত উদয়সিংহকে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া, নাপিতের হস্তে সমর্পণ করিল। বিশ্বস্ত নাপিত, সেই চাঙ্গারী লইয়া, কোন নিরাপদ স্থানে গেল। এদিকে, ধাত্রী, আপনার নিদ্রিত পুত্রকে, উদয়সিংহের শয্যায় রাখিল। এমন সময়ে, বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া, ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে, অধোমুখে, স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিল। বনবীর উদয়সিংহবোধে, সেই ধাত্রীপুত্রেরই প্রাণ সংহার করিয়া, চলিয়া গেল। এ দিকে, রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদনধ্বনির মধ্যে, সেই ধাত্রীপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ধাত্রী নীরবে অশ্রুপূর্ণনয়নে, স্বীয় শিশু সন্তানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখিয়া, নাপিতের নিকট গমন করিল।

এইরূপে পান্না, অবলীলাক্রমে, অসঙ্কোচে, আপনার হৃদয়রঞ্জন শিশু সন্তানকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রের প্রাণরক্ষা করিল। যে রমণী চিতোরের জন্য, বাপ্পারাওর বংশরক্ষার নিমিত্ত, জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুত্তলী সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে, তাহার রাজভক্তি কত দূর উচ্চ? যে রমণী, হৃদয়রঞ্জন কুসুমকোরককে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও, আপনার কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ না

* রাজস্থানে এই জাতি "বারি" নামে প্রসিদ্ধ। রাজপুতদিগের উচ্ছিষ্টমোচন করা ইহাদের কার্য্য।

হয়, তাহার হৃদয় কতদূর তেজস্বিতার পরিপোষক। এই মহানু স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সী রাজভক্তির গৌরব বুঝিতে পারে, এরূপ লোক বিরল।

বড়বানল।

বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রতিদিন যে, কত শত নিগূঢ় তত্ত্বের আবিস্কার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পূর্ব্বে যাহা কেবল কল্পনাসম্ভূত বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে, তাহা বিজ্ঞানের প্রসাদে প্রত্যক্ষীভূত প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়া, পরিগণিত হইতেছে। এস্থলে যে অগ্নির বিষয় বিবৃত হইতেছে, তাহাতেও বিজ্ঞানের চাতুর্য্য লক্ষিত হইবে।

বারিরাশির মধ্যে যে, অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, তাহা আমাদের দেশে অনেকেই অবগত আছেন। এই অগ্নি বড়বাগ্নি বা বড়বানল নামে প্রসিদ্ধ। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে, এই বড়বাগ্নির সম্বন্ধে, মতভেদ দৃষ্ট হয়। মেয়ারনামক একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা, এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, প্রখর আতপতপ্ত হীরক প্রভৃতি পদার্থ, যে কারণে, অন্ধকারময় গৃহে অগ্নিকণার বিকিরণ করে, সেই কারণে, সাগরের বারিরাশি হইতেও, পাবকশিখা উত্থিত হইয়া থাকে। দিবাভাগে, সমুদ্রের জল অবিরত সূর্য্যকিরণ আকর্ষণ করে; রাত্রিকালে সেই আকৃষ্ট কিরণ, পাবকশিখারূপে প্রতিভাত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মতে, সমুদ্রের জল, ফস্‌ফরস্‌নামক রাসায়-

নিক বস্তুবিশেষের ধর্ম্মবিশিষ্ট ; এজন্য, বায়ুর সংযোগে, তাহা হইতে আলোকশিখা নির্গত হয়। অন্য এক সম্প্রদায় নির্দ্দেশ করেন, বিভিন্ন তাড়িতবিশিষ্ট মেঘখণ্ড হইতে যেরূপ তড়িল্লতার উৎপত্তি হয়, সাগরের ঊর্ম্মিমালার সংঘর্ষণেও, সেইরূপ তাড়িতপ্রবাহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ঐ তাড়িতপ্রবাহ বড়বানল নামে প্রসিদ্ধ। ঐ তাড়িত, সমুদ্রের সলিলরাশিতে নিয়ত অবস্থিতি করে, কি, অন্য কোন স্থান হইতে উপস্থিত হয়, পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাহার কোন মীমাংসা করেন নাই। কিন্তু, এই সকল বৈজ্ঞানিকের মতের প্রতি, এক্ষণে কাহারও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা দেখা যায় না। এগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ, সামুদ্রিক কীটবিশেষ পরীক্ষা করিয়া, বড়বানলের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তর মেকৃকালক্, বারংবার পরীক্ষা করিয়া, স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমুদ্রসলিলে, যে সকল প্রাণী বাস করে, তাহাদের গলিত শব হইতে বড়বাগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমুদ্রের জল, সাধারণতঃ নীলবর্ণ ; কর্দ্দম, শৈবাল ও কীটাণু প্রভৃতির সংযোগে, সময়ে সময়ে, উহা শুভ্র ও হরিদ্বর্ণ হইয়া থাকে। শুভ্র ও হরিদ্বর্ণ জলরাশিতে বড়বাগ্নির আধিক্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু, সাগরবারি যতই দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ হয়, বড়বাগ্নি ততই চারিদিকে প্রসারিত হইয়া উঠে।

কেবল সামুদ্রিক মৃত জীবের দেহ হইতে, ঐ আলোকের উদ্ভব হয় না, সময়ে সময়ে সজীব প্রাণীর শরীর হইতেও উহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ডাক্তার বুকানন, এ বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা একদা অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া, ভারতমহাসাগরের উত্তরাংশে যাইতে যাইতে, দেখিলাম, জলরাশি অপূর্ব্ব শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। আকাশ পরিচ্ছন্ন

ও উজ্জ্বল নীলাভ ; কেবল অদূরে কিয়দংশ কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছিল। সায়ংকাল হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত, সাগরসলিলের শুভ্রতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; আটটা হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত, উহা এরূপ পরিষ্কৃত শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিল যে, সাগরতলের সহিত ছায়াপথের তুলনা করা অসঙ্গত বোধ হইল না। অধিকন্তু, ছায়াপথে যেমন উজ্জ্বল তারকা দৃষ্ট হয়, সমুদ্রের শ্বেতবর্ণ বারিরাশিতেও সেইরূপ অনলকণা দেখা যাইতে লাগিল। রাত্রি দুই প্রহরের পর হইতে, ঐ আলোকশিখা ক্রমে হ্রস্ব হইতে লাগিল, পরে উষাকালে, উহা একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঐ কিরণজালে অর্ণবপোতের উপরিভাগ এরূপ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, পোতস্থ দ্রব্যাদি স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল।

বুকানন, এই বিস্ময়কর ব্যাপারের কারণনির্ণয়ার্থ, সেই সমুদ্রের কয়েক পাত্র জল তুলিয়া পরীক্ষা করেন। তাহাতে জলমধ্যে, যবোদরের এক ষোড়শাংশপরিমিত কতকগুলি দীপ্তিশীল কীটাণু দৃষ্ট হয়। সাধারণ কীটাণু সকল, জলে যে ভাবে সন্তরণ করে, এগুলিও সেই ভাবে বেড়াইতেছিল। বুকানন, কয়েকটি কীটাণু অঙ্গুলির অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া দেখেন, উহা হইতে আলোকশিখা নির্গত হইতেছে। উহা প্রদীপের নিকট ধরাতে, ঐ আলোক অন্তর্হিত হইয়া গেল। সাড়ে তিন সের জলে, প্রায় চারি শত কীটাণু দৃষ্ট হইয়াছিল, অথচ উহাতে জলের স্বাভাবিক বর্ণের কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। বেনেট নামক এক জন সমুদ্রযাত্রীর লিখিত বিবরণেও এই রূপ সামুদ্রিক আলোকের বিষয় দৃষ্ট হয়। ইনি লিখিয়াছেন, 'আমি একদা, হরণ অন্তরীপের নিকট, রাত্রিকালে পোতারোহণে বিচরণ করিতেছিলাম ; বায়ু নিস্তব্ধ ও চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। হঠাৎ দেখিলাম, সাগরগর্ভ হইতে আলোকশিখা, অন্ধকার

ভেদ করিয়া উঠিতেছে। সাগরের জলরাশি নিশ্চল থাকাতে, ঐ আলোক প্রথমে ক্ষীণপ্রভ ছিল, কিন্তু পোতের গতিপ্রযুক্ত জল তরঙ্গায়িত হওয়াতে, ঐ বহ্নিশিখা এরূপ দীপ্তিশালিনী হইল যে, সমস্ত অর্ণবযান আলোকমালায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যানের এক পার্শ্বে একখানি জাল আকর্ষণ করাতে বোধ হইল যেন, ধূমকেতুর ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট একটি অগ্নিপিণ্ড সবেগে গমন করিতেছে। মৎস্যসমূহের উল্লম্ফনে বোধ হইল, তরঙ্গায়িত সাগরবারিতে, উজ্জ্বল বহ্নিরেখা অঙ্কিত হইতেছে।

বেনেট সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এক প্রকার চাঁদা মৎস্য হইতে উক্ত আলোকশিখা নির্গত হইয়াছিল; ঐ মৎস্যের আকার গোল, বর্ণ তরলপীত এবং পরিধি প্রায় আট ইঞ্চি। উহার দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগের এক পার্শ্বে, এক খণ্ড অধিমাংস আছে। কণ্টকবিশিষ্ট পক্ষ, ঐ অধিমাংসের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। উত্তেজিত হইলেই মৎস্যসমূহ, সকণ্টকপক্ষ-বিশিষ্ট অধিমাংস ঘন ঘন কম্পিত করে, এই কম্পনে উহা হইতে আলোক নির্গত হয়। মৎস্য যতই প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে, আলোকশিখা ততই মন্দীভূত হইতে থাকে। অধিকন্তু, ঐ মৎস্যের শরীরে নির্যাসবৎ এক প্রকার পদার্থ আছে, উহা জলের সহিত মিশ্রিত হইলেও, আলোকের উৎপত্তি হয়। বেনেট, এই জাতীয় কয়েকটি মৎস্য পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ জলের আলোকবিকিরণ শক্তি জন্মিয়াছে। বেনেটের পরীক্ষায়, এই চাঁদা মৎস্য ব্যতীত, আরও কয়েক প্রকার আলোকপ্রদ ক্ষুদ্র মৎস্য সাধারণের পরিজ্ঞাত হইয়াছে। এই সকল মৎস্যের দেহের সাধারণ বর্ণ ইস্পাতের বর্ণের ন্যায়; কেবল শল্ক ও পক্ষ পাংশুবর্ণ, দেহের নিম্নভাগে একশ্রেণী অনতিগভীর রন্ধ্র আছে। বেনেট সাহেব, উক্ত

মৎস্য জলপূর্ণ পাত্রে ছাড়িয়া দিলে, উহা মহোল্লাসে সন্তরণ করিতে লাগিল, উহার দেহস্থিত রন্ধ্রসমূহ হইতে নক্ষত্রজ্যোতির ন্যায় কখন স্তিমিত, কখন দীপ্তিশীল আলোক নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহার পর, ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করাতে, যখন উহা উত্তেজিত হইয়া, সবেগে সন্তরণ করিতে লাগিল, তখন কেবল পূর্ব্বোক্ত রন্ধ্রসমূহ হইতে আলোক বিকীর্ণ হইল না, প্রত্যুত দেহের সমস্ত অংশ হইতেই উজ্জ্বল বহ্নিশিখা নির্গত হইয়া, জল আলোকিত করিয়া তুলিল। মৎস্য গতাসু হইলে, বহ্নিশিখা একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এইরূপে ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় স্থির হইয়াছে যে, জীবিত ও মৃত মৎস্যের দেহ হইতে এবং মৎস্যের দেহনিঃসৃত নির্য্যাসবৎ পদার্থবিশেষ জলে মিশ্রিত হওয়াতে, বড়বাগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই অগ্নি, সকল সময়ে সমান দেখা যায় না। কখন উহা তড়িল্লতার ন্যায় চঞ্চল, কখনও বা অনতিপরিস্ফুট, নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় হীনপ্রভ দেখা যায়। সময়ে সময়ে, ঐ অগ্নি, সাগরের অনেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া, চারি দিক আলোকিত করে; কখন কখনও বা, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গপটলের ন্যায় উত্থিত হইয়া, কখন স্তিমিত, কখন উজ্জ্বল হয়, কখনও বা, উহার নির্ব্বাণ হইতে থাকে। উক্ত অগ্নি, সাধারণ অগ্নির ন্যায় নহে। উহা ঈষৎ নীলাভ ও তরল পীতবর্ণ। গন্ধকোৎপন্ন বহ্নিশিখার সহিত উহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সমুদ্রচারিগণ, বহুদূর হইতে ঐ অগ্নি দেখিতে পায়। প্রবল বায়ুপ্রবাহে, জলধিতল উন্নত তরঙ্গমালায় আচ্ছন্ন হইলে, উহা, অগ্নিময় গিরিশৃঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনদেশে বদ্ধমূল হইলে, তদ্দেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ, আপনাদের দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক সমূহের অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ভারতবর্ষ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থল। কপিলাবস্তু, বুদ্ধগয়া, শ্রাবস্তী, বৌদ্ধদিগের পরমপবিত্র তীর্থ। পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রহমানসে চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ, ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যত হন। চীন হইতে ভারতবর্ষে, স্থলপথে আসিতে হইলে, অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়। বৃক্ষলতাশূন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমি, তুষারমণ্ডিত দুরারোহ পর্ব্বত, অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট, পদে পদে পথিকের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু, অধ্যবসায়সম্পন্ন চীনদেশীয়গণের অধ্যবসায় বিচলিত হইল না। তাঁহারা, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন, পথের এই দুর্গমতা, তাঁহাদের নিকট সামান্য বোধ হইল। প্রথমে কয়েক জন, স্বদেশ হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। কেহ কেহ, গোবি মরুভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, কেহ কেহ, অগম্য স্থানে উপনীত হওয়াতে, স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। সাহসী পরিব্রাজক চিটেওয়ান্, খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, কিন্তু সাধারণের নিকট, আপনার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতে পারিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবশেষে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে একটি ক্ষুদ্র দল, কষ্টে বহু বহু বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক সপ্তসিন্ধুর প্রসন্নসলিলবিধৌত ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই

ক্ষুদ্র দলে পাঁচ জন শ্রমণ ছিলেন। ইঁহাদের অধিনায়কের নাম ফা-হিয়ান। ফা-হিয়ান, পনর বৎসর ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত। ফা-হিয়ানের পরে, হোইসেঙ্গ্ ও সঙ্গ্-য়ুনের ভ্রমণ-বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই দুই জন শ্রমণ, খ্রীঃ ৫১৮ অব্দে চীনের সম্রাটপত্নী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার এক শত বৎসর পরে, আর এক জন ধর্ম্মবীর স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া, নানা শাস্ত্রপাঠে ভুয়দর্শিতা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া, সাধারণের সম্পূজিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত, গবেষণা ও দূরদর্শিতায় পরিপূর্ণ। ইনি, ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থার যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সাধনা যেমন বলবতী ছিল, সিদ্ধিও তেমনি মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুদর্শিতা লাভের জন্য, বিঘ্নবিপত্তিপূর্ণ সময়ে, রাজার অজ্ঞাতসারে, রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে, স্বদেশ হইতে যাত্রা করেন, শেষে অভীষ্ট বিষয় সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া, রাজদত্ত সম্মানে গৌরবান্বিত হন। চীনের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবিচলিতহৃদয়, ধর্ম্মবীরের নাম হিউএন্ থ্সঙ্গ্।

হিউএন্ থ্সঙ্গ্ চীন দেশের কোন একটি উপবিভাগের নগরে, খ্রীঃ ৬০৩ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে চীন সাম্রাজ্য, দীর্ঘকালস্থায়ী অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, হিউএন্ থ্সঙ্গের পিতা কোন রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, শেষে কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার সন্তানচতুষ্টয়কে শিক্ষা দিতে, অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এই চারি সন্তানের

মধ্যে, দুইটি বাল্যকালেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সারগ্রাহিতার জন্য, প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহাদের অন্যতরটি হিউএন্ থ্সঙ্গ্।

হিউএন্ থ্সঙ্গ, প্রথমে একটি বৌদ্ধমঠে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেও, তিনি, অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিয়া, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ বৌদ্ধ যতির শ্রেণীতে নিবেশিত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স তের বৎসর।

হিউএন্ থ্সঙ্গ্, পরবর্ত্তী সাত বৎসর, ভ্রাতার সহিত প্রধান প্রধান তত্ত্ববিৎ ও প্রধান প্রধান অধ্যাপকের উপদেশ শুনিবার জন্য, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। দেশে সর্ব্বদা বিগ্রহের গোলযোগ থাকাতে, তাঁহার নির্জ্জনপাঠের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে, তিনি, দূরতর স্থানের নির্জ্জন প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অশান্তিতেও বিদ্রোহের এইরূপ বিঘ্নবিপত্তিপূর্ণ সময়েও, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ অধ্যয়ন হইতে বিরত হন নাই। শাস্ত্রালোচনা, তাঁহার একটি পবিত্র আমোদ ছিল। তিনি, যে স্থানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই কোন নূতন বিষয় শিখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। কুড়িবৎসর বয়সে, হিউএন্ থ্সঙ্গ, বৌদ্ধ পুরোহিতের পদে অধিরূঢ় হন। এই নবীন বয়সে, তিনি, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় স্বদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাদের পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক, বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ এবং স্বদেশের দর্শনশাস্ত্র, সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি, চীনের প্রধান প্রধান শাস্ত্রালোচনার স্থানে, ছয় বৎসর কাল, অবিচ্ছিন্নভাবে প্রধান প্রধান তত্ত্ববিদ্গণের পদতলে বসিয়া, ধর্ম্মোপদেশে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে, এই সকল তত্ত্ববিৎ, তাঁহার সমুদয় প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হইলেন। বুদ্ধ, যেমন জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ

অধ্যাপকের ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ তেমনই অনেকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কোথায় প্রকৃত তত্ত্বলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি, স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ধর্ম্ম-গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতে, তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না; বরং অনুবাদপাঠে, সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইল। তিনি, মূলগ্রন্থ পড়িবার জন্য, ভারতবর্ষে আসিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ফা-হিয়ান্‌প্রভৃতি যে সকল পরিব্রাজক, ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। এখন তিনিও, ঐ সকল পরিব্রাজকের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া, মূল ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চীনসাম্রাজ্য অন্তর্ব্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ সাম্রাজ্যের সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে পারিত না। এই সময়ে, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ ও আর কয়েক জন পুরোহিত, পরিভ্রমণে বাহির হইবার জন্য, সম্রাটের নিকট আবে-দন করিলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হইল। হিউএন্ থ্সঙ্গের সঙ্গিগণ নিরস্ত হইলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্সঙ্গ্ ভারতবর্ষে আসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। তিনি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যত হইলেন।

খ্রীঃ ৬২৯ অব্দে, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে, হিউএন্ থ্সঙ্গ্, এইরূপ অবিচলিতহৃদয়ে, বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে পীত নদীর (হোয়াং হো) তীরে আসিলেন। এই স্থানে ভারতবর্ষযাত্রিগণ একত্র হইয়া থাকে। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা, সকলকে রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ অপরাপর বৌদ্ধদিগের

সাহায্যে, শান্তিরক্ষকগণের দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে চরগণ, তাঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইল। কিন্তু, এই তরুণবয়স্ক বৌদ্ধ যতি, কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে, এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় ও এরূপ অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন দেখাইলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষেরা আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। এ পর্য্যন্ত, দুই জন বন্ধু, তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিলেন। এইখানে, তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ পরিচালকবিহীন ও বন্ধুবিহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিভাবে উপাসনা করিয়া, আপনার বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে, এক ব্যক্তি তাঁহার পথ প্রদর্শক হইতে সম্মত হইল। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ ইহার সঙ্গে নিরাপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু, এই পথপ্রদর্শকও মরুভূমির নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। এখন আরও পাঁচটি রক্ষামন্দির অতিক্রমকরা বাকী ছিল। প্রতি রক্ষামন্দিরে রক্ষিগণ দিবারাত্রি পাহারা দিত। এদিকে, সুবিস্তৃত মরুভূমিতে, অশ্বের পদচিহ্ন বা কঙ্কাল ব্যতীত পথজ্ঞাপক অন্য কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিউএন্ থ্সঙ্গ্ বিচলিত হইলেন না। তিনি মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্ত হইয়াও, ধীরভাবে প্রথম রক্ষামন্দিরের নিকটে উপনীত হইলেন। এই স্থানে রক্ষিবর্গের নিক্ষিপ্ত বাণে, তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইতে পারিত, কিন্তু এক জন ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ, এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সাহসী তীর্থযাত্রীকে, যাইতে অনুমতি করিলেন, এবং অন্যান্য রক্ষামন্দিরে যাহাতে, ইঁহার কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য, তত্রত্য অধ্যক্ষদিগের নামে এক একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ্, রক্ষামন্দির সকল অতিক্রম

করিয়া, আর একটি মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে, এই স্থানে তিনি পথহারা হইয়া পড়িলেন। যে চর্ম্মভাণ্ডে করিয়া, তিনি, জল আনিতেছিলেন, তাহা হঠাৎ ফাটিয়া গেল। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ পথহারা হইয়া, সেই ভীষণ মরুভূমিতে, জলের অভাবে, বড় কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার অটল সাহস ও অধ্যবসায় এতক্ষণে বিচলিতপ্রায় হইল। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। অকস্মাৎ যেন কোন অভাবনীয় শক্তির প্রভাবে, তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ কহিলেন, "আমি শপথ করিয়াছি, যাবৎ ভারতবর্ষে উপনীত না হইব, তাবৎ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হইল? কেন আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম? পশ্চিমে যাইতে প্রাণ যায়, তাহাও ভাল। তথাপি জীবিত অবস্থায় পূর্ব্ব দিকে ফিরিব না।" হিউএন্ থ্সঙ্গ, আবার পশ্চিম দিকে ফিরিলেন, এক বিন্দু জল পান না করিয়া, চারি দিন, পাঁচ রাত্রি, সেই ভয়ঙ্কর মরুভূমি দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি, এই সময়ে কেবল পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক হইতে উপদেশসকলের আবৃত্তি করিয়া, হৃদয়ের শান্তিসম্পাদন করিতেন। তরুণবয়স্ক ধর্ম্মবীর, এইরূপে কেবল ধর্ম্মোপদেশের বলে বলীয়ান্ হইয়া, একটি বৃহৎ হ্রদের তটে উপস্থিত হইলেন। এই জনপদ, তাতারদিগের অধিকৃত। তাতা-রেরা হিউএন্ থ্সঙ্গ্‌কে আদরসহকারে গ্রহণ করিল। এক জন তাতার ভূপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি, হিউএন্ থ্সঙ্গ্‌কে আপনার লোকদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা করিয়া রাখিবার জন্য, সবিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাতার ভূপতি, শেষে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ

করিলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্সঙ্গের হৃদয় বিচলিত হইল না। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "ভূপতির ক্ষমতা আছে, কিন্তু, আমার মন ও আমার ইচ্ছার উপর, তিনি কোনও ক্ষমতা স্থাপন করিতে পারেন না।" এইরূপে আবদ্ধ হইয়া, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ তাতাররাজ্যে, দেহপাত করিবার জন্য, আহারপান হইতে বিরত হইলেন। তাতার ভূপতি, এই দরিদ্র যতিকে আপনার মতে আনিবার জন্য, অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া, তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ একমাস, এই ভূপতির রাজ্যে আবদ্ধ ছিলেন, এক মাস, ভূপতি ও তদীয় পারিষদগণ, আপনাদের পবিত্রস্বভাব অতিথির নিকটে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছিলেন। এখন তাতাররাজের আদেশে, বহুসংখ্য অনুচর হিউএন্ থ্সঙ্গের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। যে চব্বিশ জন রাজার অধিকার দিয়া, এই তীর্থযাত্রীর দল যাইবে, তাতারভূপতি, তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে, এক একখানি পত্র দিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ এই অনুচরগণের সহিত অনেকগুলি তুষারমণ্ডিত দুর্গম গিরি অতিক্রম পূর্ব্বক বক্ত্রিয়া ও কাবুলীস্তান দিয়া, ভারতবর্ষে উপনীত হন। এই সকল তুষারসমাচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতে, সাত দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে, তাঁহার চৌদ্দ জন অনুচর বিনষ্ট হয়।

হিউএন্ থ্সঙ্গ্ মধ্য এশিয়ায় সভ্যতার উন্নতি দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে, মধ্য এশিয়া, বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ব্যবহার করিত। স্থানে স্থানে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে, বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক

সকল অধীত হইত। কৃষিকার্য্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্য, যব, আঙ্গুর প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে উৎপন্ন হইত। অধিবাসীরা রেসম ও পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত। প্রধান প্রধান নগরে, সঙ্গীতব্যবসায়ীরা গীতবাদ্যে আসক্ত থাকিত। এই জনপদে, বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল, স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও হইত। প্রাচীন সময়ে, গ্রীসের রাজধানী এথেন্স, যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার প্রধান স্থান বলিয়া, সমস্ত ইউরোপে সম্মানিত হইত, এই সময়ে এশিয়ার সমরখন্দ নগরেরও তেমনই প্রতিপত্তি ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা সমরখন্দবাসীদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিত। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ যেখানে গিয়াছেন, যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তৎসমুদয়েরই বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। দূরদর্শিতার গভীরতায়, ভাবের উচ্চতায় ও বর্ণনার প্রাঞ্জলতায়, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত, পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে, ঐতিহাসিক ক্ষেত্র, অভিনব প্রশান্ত জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে।

হিউএন্ থ্সঙ্গ্ মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক কাবুল দিয়া, পুরুষপুরে (পেশাবর) উপনীত হন, তৎপরে কাশ্মীরে গমন করেন। ইহার পর, তিনি, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক মগধে উপস্থিত হন। এত দিনে, এই অধ্যবসায়সম্পন্ন ধর্ম্মবীরের বাসনা পূর্ণ হয়। বিদেশী ধর্ম্মবীর আপনাদের পবিত্র তীর্থ, কপিলবস্তু, শ্রাবস্তী, বারাণসী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি দর্শন করিলেন, মধ্যভারতবর্ষের অনেক স্থান দেখিলেন, বাঙ্গালায় যাইয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থার অনুসন্ধান লইলেন, দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভূয়োদর্শিতাসংগ্রহ করিলেন; একে একে

ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান স্থানই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তিনি, প্রধান প্রধান স্থানে, প্রধান প্রধান লোকের সহিত আলাপ করিয়া, এবং প্রধান প্রধান সংস্কৃত ও বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ সকল পড়িয়া, ক্রমে জ্ঞানী ও বহুদর্শী হইয়া উঠিলেন। সহায়সম্পন্ন লোকে যাহা করিতে পারেন নাই, একটি অসহায়, বিদেশী, দরিদ্র যুবক, আপনার সাহস ও উদ্যম ও আপনার অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠার বলে তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে, হিউএন্ থ্‌সঙ্গ্ সিংহল দ্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কাঞ্চীপুরে (কঞ্চিবিরম) আসিয়া শুনিলেন, সিংহল দ্বীপ অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য, তিনি সিংহলে গেলেন না, কঞ্চিবিরম হইতে করমণ্ডল উপকূল দিয়া, কিয়দ্দূর আসিয়া, দক্ষিণাপথ অতিক্রম পূর্ব্বক মলবার উপকূলে আসিলেন; এবং সেস্থান হইতে সিন্ধুনদ দিয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের প্রধান প্রধান নগর দর্শন পূর্ব্বক মগধে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হিউএন্ থ্‌সঙ্গ্ এই স্থানে, তাঁহার সদাশয় বন্ধুগণের সহিত কিছু দিন একত্র বাস করিয়া, সাতিশয় প্রীতি লাভ করেন। ইহার পর, এই পরিব্রাজক স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি পঞ্জাব ও কাবুলীস্তান দিয়া, মধ্য এশিয়ার উন্নত ভূখণ্ডে, উপস্থিত হইলেন, এবং তুর্কিস্তান, কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোতান নগরে কিছু কাল থাকিয়া, ষোল বৎসর, ভ্রমণ, অধ্যয়ন, ও বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর, খ্রীঃ ৬৪৫ অব্দের বসন্ত কালে, আপনার গরীয়সী জন্মভূমিতে পদার্পণ করিলেন।

এই রূপে, সদাশয় ধর্ম্মবীরের ভ্রমণকার্য্য সমাপ্ত হইল। এই রূপে সদাশয় ধর্ম্মবীর, গৌরবে উন্নত হইয়া, দীর্ঘকালের পর, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি চারি দিকে

বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাট, এই প্রতিপত্তিশালী দরিদ্র পরিব্রাজকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। এক সময়ে চরগণ, যাঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল, সশস্ত্র শান্তিরক্ষকগণ, যাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ পাইয়াছিল, তিনি, এখন প্রভূত সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহার প্রবেশসময়ে, চীনের রাজধানীতে, মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজপথ সকল কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল, তাহার উপর সুগন্ধি পুষ্প সকল শোভা বিকাশ করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে জয়পতাকা সকল বায়ুভরে প্রকম্পিত হইতে লাগিল, সৈনিক পুরুষেরা পথের উভয় পার্শ্বে, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা, আপনাদের বিখ্যাত পরিব্রাজকের অভিনন্দন করিতে গমন করিলেন। দরিদ্র ধর্ম্মবীর, আপনার কৃতকার্য্যতার গৌরবে উন্নত হইলেও, বিনম্রভাবে এই মহোৎসবের মধ্যে, রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ, তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ বুদ্ধের স্বর্ণ, রৌপ্য ও চন্দন কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি ও ৬৫৬ খানি গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সম্রাট, ইহাতে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার সুসজ্জিত প্রাসাদে, তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও গুণের প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে সাম্রাজ্যের একটি প্রধান কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, হিউএন্ থ্সঙ্গ বিনীতভাবে ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, বুদ্ধের জীবনী ও নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনায়, জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার জন্য একটি মঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই স্থানে, তিনি অপরাপর

বৌদ্ধ পুরোহিতের সহিত, ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত পুস্তক-সমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত শীঘ্র লিখিত ও প্রকাশিত হইল। কিন্তু সংস্কৃত পুঁথিসমূহের অনুবাদে, তাঁহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। কথিত আছে, হিউএন্ থ্সঙ্ বহুসংখ্য সহযোগীর সাহায্যে, ৭৪০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই সকল গ্রন্থ ১,৩৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। অনুবাদসময়ে, তিনি প্রায়ই গ্রন্থের দুরূহ অংশের অর্থপরিগ্রহের জন্য, নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার মুখমণ্ডল হঠাৎ প্রসন্ন হইত, হঠাৎ যেন কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব আলোকে, তাঁহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ঘোর অন্ধকারময় স্থানে, পরিভ্রমণ-সময়ে, পথিক, সহসা সূর্য্যের আলোক পাইলে, যেমন প্রফুল্ল হয়, হিউএন্ থ্সঙ্, চিন্তা করিতে করিতে, দুরূহ অংশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া, তেমনই প্রফুল্ল হইতেন।

এই রূপে ধর্ম্মচিন্তা, গ্রন্থপ্রণয়ন ও গ্রন্থপ্রচার করিয়া, হিউএন্ থ্সঙ্ ক্রমে ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। তিনি, মৃত্যুসময়ে, আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে, বিতরণ করিলেন, এবং আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের নিকটে বিদায় লইলেন। এই অন্তিম সময়েও, তাঁহার প্রসন্নতার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রশান্তভাবে কহিলেন, "সৎকার্য্য প্রযুক্ত আমি যে কিছু প্রশংসা পাইতে পারি, তাহা কেবল আমার নিজের প্রাপ্য নয়। অপরাপর লোকেও তাহার অংশ পাইবার যোগ্য।" খ্রীঃ ৬৬৪ অব্দে হিউএন্ থ্সঙ্গের মৃত্যু হয়। প্রায় এই সময়ে বিজয়োন্মত্ত মুসলমানেরা প্রাচ্য ভূখণ্ড নরশোণিতে রঞ্জিত করিতেছিল, আর এই সময়ে, জর্ম্মণির অন্ধকারময় আরণ্য প্রদেশে, খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল।

শিষ্টাচার।

কেহ অশিষ্টের আদর করে না। হাজার গুণ থাকিলেও, অশিষ্ট ব্যক্তি, লোকের নিকটে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। লোকসমাজে শিষ্টতার যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, ব্যবহারের সময়ে, সর্ব্বতোভাবে, সেইরূপ রীতির অনুসরণকরা কর্ত্তব্য, অন্যথা, কখনই লোকানুরাগলাভ করিতে পারা যায় না। অসাধারণ কার্য্যদ্বারা, প্রশংসালাভ করা, সকলের সুসাধ্য নহে, সকল সময়ে, সেই কার্য্যসম্পাদনের সুযোগও উপস্থিত হয় না। কিন্তু, অভিবাদন, হস্তস্পর্শ, সপ্রণয় সম্ভাষণ ও অভিনন্দন দ্বারা, লোকের হৃদয় আকর্ষণকরা, সহজ ও সকলের ক্ষমতার আয়ত্ত। এই সকল বিষয়ে, অবহেলা করিলে, লোকানুরাগ ও লোকখ্যাতিলাভ করা, দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কোন বিষয়ে, কোন অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির শিষ্টাচারের ত্রুটি লক্ষিত হইলে, লোকে সেই ত্রুটি, তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সাধারণের ঐরূপ কোন ত্রুটি দেখিলে, তাহারা বড় বিরক্ত হইয়া উঠে।

শিক্ষকের নিকটে বা পুস্তকপাঠে, এইরূপ শিষ্টাচারের শিক্ষা হয় না। উহা শিখিতে হইলে, মনোযোগপূর্ব্বক লোকব্যবহারের দিকে, দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি শিষ্ট ব্যক্তির সহিত একত্র বাস ও সাধারণকে প্রীত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, স্বভাবতঃ, শিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। যে শিষ্টাচরণে উপেক্ষা করে, তাহার সহিত কেহই শিষ্ট ব্যবহার করে না, সুতরাং সহজেই তাহার সম্মান নষ্ট হয়। সকলের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহারকরা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদিগকে একবারে আকাশে তুলা উচিত নহে। এইরূপ

করিলে, লোকে তাহাকে স্তাবক ও তোষামোদপর বলিয়া ঘৃণা করে।

অনেকে সামান্য শিষ্টাচরণে এরূপ কৌশল দেখায় যে, সহজেই লোকের হৃদয় আর্দ্র হয়। যাঁহাদের সহিত কোন রূপ ঘনিষ্ঠতা বা গাঢ়তর প্রণয় নাই, আলাপের সময়ে, তাঁহাদের গৌরবরক্ষা করিবে; বিনীতভাবে, বয়োবৃদ্ধদিগের মর্য্যাদারক্ষায় তৎপর থাকিবে; অধীনস্থ কর্ম্মচারী বা ভৃত্যবর্গের সহিত স্নিগ্ধ বন্ধুর ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিবে এবং গুণবিশেষে আদর দেখাইবে। অপরের চিত্তরঞ্জনের সময়ে, আপনার মানসম্ভ্রমের দিকেও, দৃষ্টি রাখা উচিত। কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, সেই পরামর্শের ঔচিত্যসম্বন্ধে, আপনার মতও প্রকাশকরা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা দূষণীয়। তুচ্ছ শিষ্টাচারের অনুরোধে, আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মের ব্যাঘাত করা, মূঢ়তার কার্য্য। অধিকন্তু, যেখানে শিষ্টতারক্ষা করিলে, নিজের ও পরের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সেখানে শিষ্টব্যবহার করা অশিষ্টের কর্ম্ম।

মানস সরোবর।

আমাদের দেশের অনেকের মুখেই, মানস সরোবরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যসংসারে এই সরোবর বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার কবিগণ, প্রায়ই ইহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মানস সরোবর, যেমন কবিতাদেবীর প্রিয়তম বিষয়, তেমনই পুণ্যসঞ্চয়েরও প্রধান উপায়। হিন্দু ও তিব্বত-

দেশীয়দিগের মতে, মানস সরোবর দর্শন ও বেষ্টন করিলে, সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

মানস সরোবর, প্রকৃতির যুগপৎ ভীষণ ও রমণীয় প্রদেশে অবস্থিত। ইহার প্রায় চারি দিকই, পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এক দিকে অত্যুচ্চ হিমালয়, ইহার তটদেশে তুষাররাশি প্রক্ষেপ করিতেছে; অন্য দিকে ধবলকায় কৈলাস গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; অপর দিকে, উন্নত ভূখণ্ডসমূহ গিরিসঙ্কট প্রভৃতির আকারে অবস্থিতি করিতেছে। এই সরোবরের আকার আয়ত ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার নিকটে বৃক্ষসমাকীর্ণ বনভূমি নাই, কেবল শুষ্ক তৃণগুল্মাদি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। হ্রদের তটদেশের ভূমি শুষ্ক ও দৃঢ়; কোন পল্বল বা কর্দ্দমময় স্থান নাই। জল স্বচ্ছ ও স্বাদু। জলের মধ্যে, কোন প্রকার পানা অথবা তৃণপ্রভৃতি দেখা যায় না, কেবল জলের নিম্নে ঘাস জন্মিয়া, তরঙ্গবেগে তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মানসে সুবর্ণনলিনীর আবির্ভাব, কেবল কবিকল্পনা মাত্র।

মানস সরোবরের পরিধি পঞ্চাশ মাইল। ইহা, চারি দিনে বেষ্টন করা যায়। কেহ কেহ বলেন, তীর্থযাত্রিগণ পাঁচ ছয় দিবসে, ইহার চারি দিক ঘুরিয়া আইসে। এই সরোবরে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়। পবিত্র স্থানের মৎস্য বলিয়া, স্থানীয় লোকে, উহা ভোজন করে না। প্রবল বাত্যাবেগে সরোবরে, সময়ে সময়ে ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হয়। তরঙ্গের আঘাতে, জলস্থিত মৎস্য সকল তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে হংসপ্রভৃতি নানাবিধ পক্ষী, এই সরোবরের নিকটে বাস করে, কিন্তু শীতকাল উপস্থিত হইলেই, উহারা ভারতবর্ষে চলিয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয়, আমাদের দেশের কবিগণ কহিয়া থাকেন, বর্ষাসমাগমে, হংস সকল মানস সরোবরে গমন করে।

কার্ত্তিক মাসে এই হ্রদের তটসন্নিহিত জল জমিতে থাকে। কিন্তু, বায়ুর প্রবল বেগপ্রযুক্ত অগ্রহায়ণ মাস শেষ না হইলে, উপরিভাগের সমস্ত জল জমে না। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে, সমুদয় সরোবর-তল কঠিন তুষারময় হইয়া যায়। এই সময়ে গবাদি পশু হাঁটিয়া মানস সরোবর পার হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে কঠিন বরফ রাশি, ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। বৈশাখে ভগ্ন বরফখণ্ড হ্রদের ইতস্ততঃ ভাসিতে থাকে। ইহার পর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে, সমস্ত হ্রদ, পুনর্ব্বার জলময় হইয়া যায়।

পুরাণের মতে, শতদ্রু নদী মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে, মানস সরোবর, শতদ্রুর উৎপত্তিস্থান নহে। ইঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, রাবণ হ্রদ হইতে শতদ্রুর উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক, মানস সরোবরের সহিত কোন নদীর সংযোগ আছে কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেই অনুসন্ধান করিয়াছেন। মুরক্রফ্ট্‌নামক এক জন ভ্রমণকারী, কোন নদী দেখিতে পান নাই। কিন্তু তিনি শুনিয়াছেন, পূর্ব্বে, মানস সরোবরের সহিত রাবণ হ্রদের সংযোগ ছিল। গেরার্ড নামক অন্য এক জন ভ্রমণকারী অবগত হইয়াছেন যে, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, একটি বেগবতী স্রোতস্বতী দ্বারা মানস সরোবরের সহিত রাবণ হ্রদের সংযোগ ছিল। পার হইবার জন্য, ঐ নদীর উপরে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন উক্ত নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিব্বত দেশের যে সকল লোক, মানস সরোবরের তটে বাস করে, তাহাদের বিশ্বাস, ভূগর্ভ দিয়া, এই হ্রদের সহিত কোন জলপথের সংযোগ আছে। চীনদেশের একজন রাজপুরুষ কহিয়াছেন, পূর্ব্বে একশতটি নদী এই সরোবরে পতিত হইত, উহাদের একটি দ্বারা, মানস সরোবরের সহিত রাবণ হ্রদের

সংযোগ ছিল, এখন ঐ নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মানস সরোবরের জল সুস্বাদ ও স্বচ্ছ। কোনরূপ নদীর সহিত সংযোগ না থাকিলে, জলাশয়ের জল এমত স্বাদু ও স্বচ্ছ হয় না। বদ্ধজল হ্রদের বারি, প্রায়ই লবণাক্ত ও বিস্বাদ হইয়া থাকে। এই জন্য, অনেকে অনুমান করেন যে, ভূগর্ভ দিয়াই হউক, অথবা ভূপৃষ্ঠ দিয়াই হউক, মানস সরোবরের সহিত কোন-রূপ জলপথের সংস্রব আছে। চারি দিকে, পর্ব্বতমালা বর্ত্তমান থাকাতে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাবণ হ্রদের ন্যায় মানস সরোবরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পতিত হয়। গ্রীষ্মকালে বহুসংখ্য ক্ষুদ্র নদী রাবণ হ্রদ হইতে বহির্গত হয়। কথিত আছে, উহাদের একটি, মানস সরোবরের সহিত মিলিত হইয়া থাকে।

সকলেই মানস সরোবরের জোয়ারভাটার পরিমাণ করিয়া-ছেন। কোনপ্রকার জলপথ না থাকিলে, জোয়ারভাটার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। সরোবরজলের এই হ্রাসবৃদ্ধিও, জলপথের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে, একটি প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের চারিটি প্রধান নদ ও নদী (সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ও সরযূ) মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নির্গত হইয়াছে। এই স্থানের উচ্চতা অধিক। সমুদ্রতল হইতে মানস সরোবর অন্যূন ১৭,০০০ ফীট উচ্চ। লামা ও সংসারপরিত্যাগী তপস্বিগণ সমস্ত বৎসর, এই সরোবরের তটে বাস করেন। যাত্রি-গণ ইঁহাদিগকে যাহা কিছু দেয়, তাহাতেই ইঁহাদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হয়। মানস সরোবরের উচ্চতা ধরিলে, বোধ হইবে, পৃথিবীতে মানবজাতির অধ্যুষিত যতস্থান আছে, তাহার মধ্যে, এই তটভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত।

ভিন্ন দেশের অনেক গ্রন্থকার ও পর্য্যটক, মানস সরোবরের

বিষয় উল্লেখ করিয়াছে। মোগল সম্রাট আকবর শাহ, যখন কাবুলে যাত্রা করেন, তখন এক জন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। ইনি, তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে, যে সমস্ত বিবরণসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, মানস সরোবর সর্হিন্দের প্রায় ৩৫০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইউরোপীয়গণের মধ্যে,সর্ব্বপ্রথমে পিআণ্ডাডা নামক এক ব্যক্তি, ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে, এই সরোবর দর্শন করেন। ভোতারদেশীয়দিগের মধ্যে, মানস সরোবর "মেপাঙ্গচো" নামে প্রসিদ্ধ।

মানস সরোবরের দৃশ্য অতি রমণীয়। এই দৃশ্যে মনোমধ্যে অতি গভীর ভাবের আবির্ভাব হয়। ইহার যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই দেখিবে, সুবিস্তৃত ও সমুন্নত পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্যভাগে সুবিস্তীর্ণ স্বচ্ছ সরোবর। সরোবরের জলরাশির মধ্যভাগ হরিদ্বর্ণ। হংসকুল, এই হরিদ্বর্ণ জলরাশির মধ্যে, মৃদুপবনসঞ্চালিত তরঙ্গাবলীর সহিত নাচিয়া বেড়ায়। সময়ে সময়ে, ঐ মৃদু তরঙ্গমালা প্রবল বায়ুবেগে ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে, নিসর্গরাজ্যের এই ভীষণ ও রমণীয় দৃশ্য নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিকর। এইরূপ রমণীয়তা ও এইরূপ সৌন্দর্য্যবশতঃ, সুকবির রসময়ী লেখনী হইতে মানস সরোবরের গৌরবকাহিনী নিঃসৃত হইয়াছে।

শাস্ত্রালোচনা।

শাস্ত্রালোচনা, একপ্রকার আমোদ। যখন নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, মন বিরক্ত হইয়া উঠে, তখন নির্জ্জনে, শাস্ত্রের আলোচনা করিলে, সুখে সময় অতিবাহিত হয়। বাগ্মিতা, শাস্ত্রচর্চ্চার দ্বিতীয় ফল। বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ আয়ত্ত থাকিলে, যুক্তি-পূর্ণ বাক্‌চাতুরী দ্বারা সাধারণের মন আকৃষ্ট ও অভিমত বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। শাস্ত্রালোচনায়, বিচারশক্তিরও বিকাশ হইয়া থাকে। বুদ্ধি থাকিলে, বহুদর্শন দ্বারা প্রাবীণ্যলাভ হয় বটে, কিন্তু সৎপরামর্শ দিয়া, কোন দুরূহ কার্য্যসাধন করিতে হইলে, নানা শাস্ত্রে, বুদ্ধি সংস্কৃত ও মার্জ্জিত করা আবশ্যক।

শাস্ত্রালোচনার এই প্রকার মহৎ ফল থাকিলেও, কেবল উহাতেই আসক্ত থাকিয়া, আয়ুঃক্ষয় করা, নিরবচ্ছিন্ন আলস্যপ্রকাশ মাত্র। আলাপের সময়ে, অলঙ্কার প্রয়োগ ও শব্দঘটাপ্রকাশ করা, কেবল বিদ্যাভিমানীর কার্য্য, আর বিচারের সময়ে, সকল বিষয়েই শাস্ত্রীয় নিয়মের অনুসরণ করা, পণ্ডিতমূর্খের কর্ম্ম। সহজ জ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞানে সংস্কৃত ও ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। পুস্তক পড়িলেই কিছু বিজ্ঞতা জন্মে না, পরিদৃশ্যমান জগতের ব্যবস্থা দেখিয়া, বিজ্ঞতার উপার্জ্জন করিতে হয়। এই বিজ্ঞতাই, শাস্ত্রজ্ঞানে মার্জ্জিত হইলে, ফলোপধায়িনী হইয়া থাকে। ধূর্ত্তেরা, শাস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, সরলহৃদয় ব্যক্তিগণ ভক্তিপ্রদর্শন করেন, আর বিজ্ঞেরা ইহা কার্য্যে লাগাইয়া সার্থক করেন। বিচারক্ষমতা দেখাইয়া, বাদী বিজয় বা বিদ্যাপ্রকাশ করা, অধ্যয়নের উদ্দেশ্য নহে ; বুদ্ধিবৃত্তি

মার্জ্জিত করাই অধ্যয়নের মুখ্য প্রয়োজন। সকলপ্রকার পুস্তক সমানভাবে অধ্যয়নকরা, আবশ্যক হয় না। কতকগুলি অংশতঃ মাত্র পড়িতে হয়, কতকগুলিতে নয়নাবর্ত্তন করিলেই হয়, কতকগুলি গাঢ় অভিনিবেশসহকারে আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিতে হয়, সংগ্রহমাত্র পাঠ করিয়া, বা পরের মুখে শুনিয়া, কতকগুলির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ সকল, মূল দেখিয়াই পড়া উচিত; সে সকলের সংগ্রহপাঠে তাদৃশ উপকার হয় না। পরিস্রুত জল ও পরিস্রুত পুস্তক, উভয়ই তুল্য, উভয়ই সমান বিস্বাদ ও সমান অতৃপ্তিকর।

শাস্ত্রালোচনায়, বহুদর্শী হওয়া যায়; অপরের সহিত শাস্ত্রালাপ করিলে, বাগ্মিতা জন্মে; রচনা লিখিলে শাস্ত্রজ্ঞান পাকা হইয়া উঠে। রচনার আর একটি গুণ এই যে, কোন সদ্‌গ্রন্থ পড়িয়া, সেই গ্রন্থোক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিলে, স্মৃতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। যদি রচনা লিখিবার অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে অসাধারণ মেধা থাকা চাই, যদি অন্যের সহিত শাস্ত্রালাপ না হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ প্রতিভা থাকা আবশ্যক, আর যদি অধ্যয়নে ন্যূনতা থাকে, তাহা হইলে সেই ন্যূনতার গোপন করিবার জন্য, অনেক উপায় করিতে হয়, নচেৎ বিজ্ঞসমাজে সম্ভ্রমরক্ষা পায় না।

ইতিহাসপাঠে বিজ্ঞতা, সাহিত্যপাঠে শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্য, পদার্থবিদ্যাপাঠে গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্মনীতিপাঠে ধীরতা ও তর্কশাস্ত্রপাঠে বিচারপটুতা জন্মে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রম করিলে, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের দৌর্ব্বল্য নষ্ট হয়, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শাস্ত্রের অনুশীলন করিলে, ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ন্যূনতা অন্তর্হিত হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত নিরতিশয় চঞ্চল, কোন বিষয়েই অধিকক্ষণ অভিনিবিষ্ট থাকে না, তাহার গণিত শাস্ত্রশিক্ষা করা উচিত, যেহেতু এই শাস্ত্রের

কোন প্রতিজ্ঞার সমাধান করিবার সময়ে, মন একটুকু অন্য বিষয়ে আসক্ত হইলেই, পুনর্ব্বার সেই প্রতিজ্ঞার মূল হইতে ধরিতে হয়। এইরূপে বারংবার ঠেকিলেই, একাগ্রতা অভ্যস্ত হইয়া আইসে। যাহার বুদ্ধি স্থূল, সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবিষ্ট হয় না, তাহার, ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। এই শাস্ত্রের আলোচনা করিলে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে। ব্যবহারশাস্ত্রেরও বিলক্ষণ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। এই শাস্ত্র পাঠ করিলে, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণপ্রয়োগ করিয়া, অভিমত বিষয় উপপন্ন করিবার ক্ষমতা জন্মে। এইরূপে, বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের অনুশীলনে, বিশেষ বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

মেঘ।

অসীম জড় জগতের কার্য্য, পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অনন্ত কৌশল লক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের সূক্ষ্ম বিচারে এই প্রাকৃতিক তত্ত্ব, অনেকাংশে সুবোধ্য হইয়াছে। গগনবিহারী মেঘের বিষয়, এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। এই মেঘেও, বিশ্বপাতার অপূর্ব্ব কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সূর্য্যের উত্তাপে, জলভাগ হইতে বাষ্প ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। এই বাষ্প, উপরিস্থিত আকাশে, শীতল বায়ুর সংস্পর্শে, ঘনীভূত হইলে, মেঘরূপে পরিণত হয়। সচরাচর আমরা, যে কুজ্ঝটিকা দেখিতে পাই, মেঘের সহিত তাহার কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। বস্তুতঃ, মেঘ ও কুজ্ঝটিকা, এক উপাদানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘনীভূত

বাষ্পরাশি, ভূমির অব্যবহিত উপরে বা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে থাকিলে, কুজ্ঝটিকা নামে অভিহিত হয়, আর, উহা ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুপ্রবাহে ভাসমান হইলে, মেঘ নামে উক্ত হইয়া থাকে। বিশাল সাগরতল, উন্নত শৈলশিখর, প্রশস্ত ক্ষেত্র, যেখানে হউক, জলীয় বাষ্প, বায়ুর নিম্নস্থিত স্তরে থাকিলেই, কুজ্ঝটিকা হইল, আর, উহা ঊর্দ্ধ গগনে বিচরণ করিলেই, মেঘ বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। কেবল অবস্থিতিভেদে কুজ্ঝটিকার সহিত মেঘের বিভিন্নতা দেখা যায়। আকার ও বর্ণ বিষয়ে, মেঘের সহিত কুজ্ঝটিকার যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা, কেবল দূরতাপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। মেঘ, কুজ্ঝটিকা অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত; উহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইলে, নানাবিধ বর্ণ নয়নগোচর হয়। কুজ্ঝটিকাতে, যদিও সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, তথাপি উহা, অত্যন্ত নিকটে অবস্থিতি করাতে, আমরা উহার বিভিন্ন বর্ণ, কিছুই বুঝিতে পারি না।

মেঘ অতিশয় চঞ্চল। উহা, কখনও স্থিরভাবে অবস্থিতি করে না। অনন্ত আকাশে বায়ুপ্রবাহ, নিয়ত নানা দিকে প্রবাহিত হইতেছে, মেঘসমূহও ঐ বায়ুরাশির সহিত নিরন্তর নানাদিকে প্রধাবিত হইতেছে। নিম্নস্থিত বায়ুরাশি, যে দিকে প্রবাহিত হয়, ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুরাশি, অনেক সময়ে, তাহার বিপরীত দিকে গমন করে; এই জন্য, দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নের মেঘখণ্ড যে দিকে পরিচালিত হয়, ঊর্দ্ধের মেঘখণ্ড, তাহার বিপরীত দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। এইরূপে, ঊর্দ্ধস্থিত মেঘসমূহ, বিভিন্ন দিক্-গামী বায়ুপ্রবাহের বলে, বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হইতেছে। সচরাচর, যে মেঘখণ্ড নিশ্চল বলিয়া প্রতীত হয়, যন্ত্রদ্বারা দর্শন করিলে, তাহারও চঞ্চলতা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে।

অসীম আকাশমণ্ডলে, অনন্ত বায়ুস্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ

সকল বায়ুস্তরের তাপ, পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট। এজন্য, সর্ব্বদা নূতন নূতন মেঘের উৎপত্তি ও বিলয় দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ণ ও আর্দ্র, বায়ুপ্রবাহ, অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুপ্রবাহের সহিত সংযুক্ত হইলে, সেই উষ্ণ বায়ুস্থিত বাষ্পসমূহের কিয়দংশ, মেঘের আকারে পরিণত হয়। আবার, যখন উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ, মেঘে আসিয়া পতিত হয়, তখন মেঘের জলকণাসকল, বায়ুর উষ্ণতায়, পুনর্ব্বার বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উঠে, সুতরাং মেঘখণ্ড বিলুপ্ত হইয়া যায়। আকাশপথে, নিরন্তর উষ্ণ ও শীতল বায়ু, ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে, সর্ব্বদা নূতন নূতন মেঘের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে। মেঘ যতই ঊর্দ্ধাভিমুখে উত্থিত হয়, ততই উগ্র, শীতল বায়ুরাশির সংস্পর্শে, পুষ্টাবয়ব হইতে থাকে, এবং উহা যতই নিম্নাভিমুখ হয়, নিম্নস্থিত উষ্ণ বায়ুরাশির সংস্পর্শে, অভ্যন্তরস্থ জলকণাসমূহ, বাষ্পাকারে পরিণত হওয়াতে, ততই উহার অবয়ব হ্রস্ব হইয়া পড়ে। মেঘের গতি নিতান্ত অল্প নহে। আমরা যে মেঘখণ্ডকে মন্দগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করি, দূরগামী বায়ুর বেগে, তাহা ঘণ্টায় ৬০। ৭০ ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, পর্ব্বতের উন্নত শৃঙ্গদেশে, মেঘখণ্ড স্থিরভাবে লম্বমান রহিয়াছে, বায়ুর প্রবল বেগেও, উহা স্থানচ্যুত হইতেছে না। এই আশুপ্রতীয়মান স্থিরতার কারণ, আর কিছুই নহে, তত্রত্য মেঘখণ্ডসকল বায়ুর প্রবল বেগে, স্থানান্তরে উড়িয়া যায়, পরে আবার বায়ুপ্রবাহের শৈত্য ও উষ্ণতায়, নূতন মেঘ উৎপন্ন হইয়া, সেই স্থান অধিকার করে। এইরূপে, মেঘের এক খণ্ড স্থানান্তরিত হইতেছে, আর এক খণ্ড উৎপন্ন হইয়া, উহার স্থান অধিকার করিতেছে; এই জন্য, সহসা দেখিলে, ঐ সকল মেঘখণ্ডকে নিশ্চল ও একস্থানে অবস্থিত বোধ হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ঊর্দ্ধ আকাশে, ভিন্ন ভিন্ন তাপের বায়ুরাশি প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু, ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুস্তর, নিম্নস্থিত বায়ুস্তর অপেক্ষা শীতল। নিম্নের বায়ুরাশির তাপাংশ অধিক হইলে, উহা ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এইরূপে ঊর্দ্ধে উঠিবার সময়, উপরিস্থিত শীতল বায়ুর সহিত উহার সংস্পর্শ হওয়াতে, অভ্যন্তরস্থ জলকণা-সমূহ ঘনীভূত হইয়া, মেঘের আকার ধারণ করে।

মেঘদ্বারা, আমাদের অধিষ্ঠানভূমি পৃথিবীর অনেক উপকার হয়। মেঘ হওয়াতেই, বৃষ্টিদ্বারা ভূমি উর্ব্বরা হইয়া থাকে। অধি-কন্তু, মেঘ আমাদের চন্দ্রাতপের কার্য্য করিয়া থাকে। মেঘ, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে থাকাতে, সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ, পৃথিবীস্থ তৃণগুল্মাদি নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

মেঘের সাধারণ বর্ণ, ধূমের ন্যায়। কিন্তু, সূর্য্যালোক, উহাতে প্রতিফলিত হইলে, নানাবিধ বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সূর্য্য-রশ্মিতে সাত প্রকার বর্ণ আছে। মেঘসমূহ, এই সকল বর্ণের আভায় রঞ্জিত হওয়াতে, বিভিন্ন বর্ণের দৃষ্ট হয়। মধ্যাহ্নকালীন মেঘ উজ্জ্বল নীলবর্ণ, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তসময়ে, উহা রক্ত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। সচরাচর যে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহা আর কিছুই নহে, মেঘস্থিত বহুসংখ্য জলবিন্দুতে, সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইলেই, উহা, বিবিধ বর্ণে সুরঞ্জিত ধনুর উৎপত্তি করে।

আমাদের দেশের কবিগণ, মেঘকে কামরূপী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ, অত্যুক্তিপূর্ণ নহে; মেঘের আকার নিরূপণকরা সুসাধ্য নয়। বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন গতি বশতঃ, মেঘেরও ভিন্ন ভিন্ন আকার হইয়া থাকে। আকারের বিভিন্নতা প্রযুক্ত প্রাকৃতভৌগোলিকগণ, মেঘের প্রধানতঃ এই তিনটি বিভিন্ন

আকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন :—অলক, স্তূপ ও স্তর। উহাদের পরস্পরের সংমিশ্রণে, অপর চারি প্রকার শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা, অলকস্তূপ, অলকস্তর, স্তূপস্তর ও বৃষ্টিপ্রদ। প্রথম তিন প্রকার মৌলিক, শেষ চারি প্রকার যৌগিক। নিম্নে উহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

যে সকল মেঘ, নভোমণ্ডলে চূর্ণিত কুন্তলের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়কে অলক মেঘ কহে। এই জলদজাল, কখন বিলম্বিত কেশদামবৎ, কখনও বা, কুঞ্চিত চিকুরের ন্যায় প্রতিভাসিত হইয়া, অনন্ত আকাশের শোভাবর্দ্ধন করে। এই মেঘ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু; উহা, নভোমণ্ডলের উচ্চতর স্থানে অবস্থান ও পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সচরাচর অলকমেঘ ভূপৃষ্ঠ হইতে, তিন মাইল ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করে; কখন কখন ৫।৬ মাইল ঊর্দ্ধেও, উহা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল মেঘ, বর্ষাবাত্যাবিহীন সময়ে, উদিত হয়। কিন্তু, যদি উহা, ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, ক্রমে ঘনীভূত হইতে থাকে, তাহা হইলে ঝঞ্ঝাবায়ুর সম্ভাবনা। সমস্ত দিন, উত্তর দিক হইতে, বায়ু প্রবাহিত হইবার পর, অলকমেঘ উদিত হইলে, লোকে, বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবায়ুর আশঙ্কা করে। যদি, উহা প্রথমে দীর্ঘসূত্রবৎ হইয়া, পরে আয়ত হইতে থাকে, এবং ক্রমে বর্ষপ্রদ মেঘের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে, বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। অলক মেঘের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট না হইলে, অনেক সময়ে, লোকে সুদিনেরই প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

স্তূপ মেঘ, প্রথমতঃ স্বল্পমাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়, পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া স্তূপাকারে পরিণত হইতে থাকে। সূর্য্যরশ্মিতে প্রদীপ্ত হইয়া, স্তূপমেঘ নানাবিধ আকার ধারণ করে। কখন উহা তুষারসমাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালার ন্যায়, কখন উন্নত শৈলশিখরের

ন্যায়, কখন ক্ষেপণীসংযুক্ত তরণীর ন্যায়, কখনও বা, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি প্রাণিগণের ন্যায় দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ, গ্রীষ্মকালেই ঐ মেঘের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রাত্রিশেষে, উহা, ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে দৃষ্টিগোচর হয়, পরে, ক্রমে ক্রমে ঐ সকল ক্ষুদ্র খণ্ড, ঊর্দ্ধগামী উষ্ণ বায়ুর প্রভাবে, একত্র হইয়া, ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে থাকে; মধ্যাহ্নকালে অনেক উচ্চে উঠিয়া, গোধূলিসময়ে নিম্নগামী শীতল বায়ুর সংস্পর্শে বাষ্পাকারে পরিণত হওয়াতে, অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু, যদি, ঐ মেঘ হঠাৎ রূপান্তরিত হইতে থাকে, এবং উহার স্তূপ সকল ভাঙ্গিয়া গেলে, যদি, উহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখায় পরিণত যৌগিক মেঘের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে বৃষ্টির সম্ভাবনা। অধিকন্তু, ঐ মেঘ সূর্য্যাস্তের সময়ে উদিত হইয়া, ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে, লোকে, ঝড়ের আশঙ্কা করে।

যে সকল মেঘ পর্ব্বতকন্দর ও নদী প্রভৃতি জলাশয়ের উপর, আস্তরণভাবে অবস্থিতি করে, তৎসমুদয়ের নাম স্তর। উহা, সচরাচর নিম্ন আকাশেই উদিত হয়। স্তরমেঘ, স্তূপমেঘের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। স্তূপমেঘ, প্রাতঃকালে উঠিয়া, মধ্যাহ্নকালে বর্দ্ধিতাবয়ব হয়, পরিশেষে ক্রমশঃ হ্রস্বাবয়ব হইয়া, অন্তর্হিত হইয়া যায়; স্তরমেঘ, সন্ধ্যার সময়ে আবির্ভূত হইয়া, রাত্রিতে বাড়িতে থাকে, এবং রাত্রিশেষে, উহা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া, বিলয় প্রাপ্ত হয়। যদি, ঐ মেঘ প্রাতঃকালে অন্তর্হিত না হইয়া, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে, শীঘ্র বৃষ্টি হইতে পারে।

যে মেঘ, প্রথমে অলকরূপে প্রতিভাত হইয়া, পরে স্তূপরূপে পরিণত হয়, তাহাকে অলকস্তূপ নামে নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ মেঘ, যখন বায়ুবেগে ছিন্নভিন্ন হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে, চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন, উহা নভোমণ্ডলে, তরঙ্গভঙ্গীবৎ অপূর্ব্ব

শোভার বিকাশ করিয়া থাকে। অলকস্তূপ মেঘ অতিশয় স্বচ্ছ। উহার অভ্যন্তর দিয়া, সূর্য্য ও চন্দ্রের দেহস্থিত চিহ্ন স্পষ্ট নয়ন-গোচর হয়। অলকস্তূপ মেঘমালার উদয়ে, আকাশমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে। নীরদনিকরখণ্ড, অলক ও স্তূপাকারে শূন্য দেশের নানাস্থানে, নানা ভাবে বিচরণ করিতে থাকে। ঐ মেঘ ঊর্দ্ধ আকাশে থাকিলে, ঝড় ও বৃষ্টির আশঙ্কা জন্মে।

অলকস্তর মেঘ, প্রথমে, অলকরূপে উৎপন্ন হইয়া, পরে, স্তরের সহিত মিশ্রিত হয়। উহার স্থূলতা অল্প, কিন্তু বিস্তৃতি অধিক। অলক মেঘখণ্ডদ্বয়, যদি নভোদেশে সমান্তরালভাবে থাকিয়া, পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে অলকস্তর মেঘের উৎপত্তি হয়। এই মেঘ, ঝড় ও বৃষ্টির প্রাক্কালে উঠিয়া থাকে। কখন কখন অলকস্তর ও অলকস্তূপ, এক সময়ে, আকাশে আবির্ভূত হইয়া, যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্যদলের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই আক্রমণে, উহারা, শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তন ও অচিরস্থায়ী নূতন নূতন আকার ধারণ করে। মেঘমালার এইরূপ সংগ্রাম দেখিলে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আহ্লাদের সঞ্চার হইতে থাকে। অলকস্তর মেঘের আবির্ভাবসময়ে, সূর্য্য ও চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে একটি পরিধি দৃষ্ট হয়। এই মণ্ডলাকার রেখা দ্বারা, ঝড় ও বৃষ্টির অনুমান করা যায়।

স্তূপস্তর, স্তূপ ও স্তর, এই উভয়বিধ মেঘের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুদূরবিস্তৃত সমতল মেঘরাশির উপর এই মেঘ, বৃহদাকার স্তূপের ন্যায় অবস্থিতি করে। প্রায়ই, ঝটিকাবৃষ্টির পূর্ব্বে, এই মেঘের উদয় হয়। এই মেঘ, অলকস্তর মেঘের আবির্ভাবসময়েও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অলকস্তর, স্তূপস্তরের পর্ব্বত-

বৎপ্রকাণ্ড দেহের উপর, অস্পষ্টরেখায় বিলম্বিত থাকিয়া, নেত্র-তৃপ্তিকর শোভা ধারণ করে। জলযানে আরোহণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিলে, বিশাল বারিধিতল, বা বিস্তীর্ণ নদ নদী হইতে, তীরস্থিত বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ বনভূমি অথবা গগনস্পর্শী শৈলমালা, যেরূপ দেখা যায়, স্তূপস্তর জলদঘটাও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মেঘ, যদি ঊর্দ্ধ আকাশে উত্থিত হইয়া, কার্পাসরাশির ন্যায় ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে, ঝড়ের সম্ভাবনা; আর, যদি নিম্নে অবনত হইতে থাকে, তাহা হইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

উল্লিখিত ছয় প্রকার মেঘের সম্মিলনে এক প্রকার ঘোর ধূম্রবর্ণ মেঘের উৎপত্তি হয়। স্তূপস্তর মেঘ হইতেই, প্রায় উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন, অলক মেঘ হইতেও, উহার উৎপত্তি হয়। ঐ মেঘ, প্রথমতঃ নীল বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, পরে সীসকবর্ণ হইয়া উঠে। এই সময়েই, বৃষ্টির সূত্রপাত হয়। কখন কখন, ঐ মেঘের কৃষ্ণবর্ণ রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই, বৃষ্টি হইতে থাকে। অলকমেঘ, বায়ুপ্রবাহে, স্তূপস্তর মেঘের সহিত মিলিত হইলে, বৃষ্টি ও শিলাপাত হয়। উহা, ঝড়ের সময়, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইলে, বজ্রপাতের সম্ভাবনা। ঐ মেঘ, বৃষ্টিপ্রদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বৃষ্টিপ্রদ মেঘ, ভূতল হইতে অনধিক অর্দ্ধ ক্রোশ ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। অলক মেঘ, দেড় ক্রোশ হইতে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত, ঊর্দ্ধে ভ্রমণ করে। স্থূলতঃ, অর্দ্ধ ক্রোশের নিম্নে ও তিন ক্রোশের ঊর্দ্ধে, প্রায়ই মেঘ দৃষ্ট হয় না। দার্জ্জিলিঙ্গ, শিমলা পাহাড় প্রভৃতি উচ্চ স্থানে আরোহণ করিলে, সময়ে সময়ে, নিম্ন ভাগে, বৃষ্টি ও ঝটিকার সঞ্চার দেখা গিয়া থাকে।

রাজা রামমোহন রায়।

যখন ভারতে, মুসলমানদিগের প্রতাপ তিরোহিত হয়, ইঙ্গরেজের আধিপত্য, যখন ভারতের নানা স্থানে, বদ্ধমূল হইতে থাকে, প্রথম গবর্ণরজেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস, যখন ইঙ্গরেজকোম্পানির অধিকৃত জনপদের শাসনকার্য্যে, ব্যাপৃত হন, তখন বাঙ্গালায় একটি মনস্বী পুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনি, বাল্যকালে, নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, নানা শাস্ত্রপাঠে ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিয়া, নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নানা সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ করিয়া, জ্ঞানের গভীরতায়, দূরদর্শিতার মহিমায় ও সৎকার্য্যের গুরুতায়, সমগ্র ভারতে, অদ্বিতীয় লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। এই অদ্বিতীয় পুরুষের নাম রামমোহন রায়।

যে সময়ে, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে সময়ে, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ, মুর্ষিদাবাদের নবাবসরকারে কার্য্য করিয়া, "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্র, মুর্ষিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী শাঁকসা গ্রামে বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে, তিনি, শাঁকাসা গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে আসিয়া, বাস করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র, অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ ও ব্রজবিনোদ। কনিষ্ঠ ব্রজবিনোদ, নবাব সিরাজউদ্দৌলার আধিপত্যকালে, মুর্ষিদাবাদে, কোন প্রধান রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে, তিনি, কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় বাসগ্রাম রাধানগরে আসিয়া, জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করেন। ব্রজবিনোদ, যেরূপ সম্পত্তিশালী, সেইরূপ দেবভক্ত ও পরোপকারী

ছিলেন। দেবসেবায় ও পরোপকারে, তিনি, আপনার উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া, সন্তুষ্ট থাকিতেন।

ব্রজবিনোদ রায়, নানাবিধ সৎকার্য্য করিয়া, ক্রমে জীবনের শেষ দশায় উপনীত হইলেন। কথিত আছে, তিনি, অন্তিম কালে গঙ্গাতীরস্থ হইয়াছেন, এমন সময়ে, শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাতরা গ্রামনিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য নামক একটি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষার্থী হইয়া, তাঁহার নিকটে আসিলেন। আসন্নমৃত্যু ব্রজবিনোদ, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের প্রার্থনাপূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন, শ্যাম ভট্টাচার্য্য, ব্রজবিনোদের কোন একটি পুত্রের সহিত, তাঁহার কন্যার বিবাহদিবার প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রজবিনোদ রায়, পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এদিকে, শ্যাম ভট্টাচার্য্য প্রগাঢ় শাক্ত, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে, ব্রজবিনোদের সহজেই অসম্মতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, দেবভক্ত ব্রজবিনোদ রায়, অন্তিম-কালে, ভাগীরথীতীরে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি, শ্যাম ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সুতরাং কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ না করিয়া, আপনার পুত্রগণের প্রত্যেককে, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের দুহিতা গ্রহণ করিতে, অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সাত পুত্রের মধ্যে ছয় জন, পিতার ঐ অনুরোধরক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। পরিশেষে, পঞ্চম পুত্র, রামকান্ত রায়, আহ্লাদের সহিত পিতৃসত্যপালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। অবিলম্বে, পরম বৈষ্ণব ব্রজবিনোদ রায়ের পুত্র রামকান্তের সহিত, শক্তিমতাবলম্বী শ্যাম ভট্টাচার্য্যের দুহিতা ফুলঠাকুরাণীর পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই রামকান্ত ও ফুলঠাকুরাণী, রাজা রামমোহন রায়ের জনক ও জননী। খ্রীঃ ১৭৭৪ অব্দে, পিতৃনিবাসভূমি রাধানগর গ্রামে, রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। রামমোহন ব্যতীত জগন্মোহন

নামে, রামকান্তের আর একটি পুত্রসন্তান ছিল। রামমোহনের একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম রামলোচন। জগন্মোহন ও রামলোচন, উভয়েই রামমোহনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

রামমোহনের মাতা ফুলঠাকুরাণী, স্বামীগৃহে আসিয়া, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা হইলেন। তাঁহার স্বভাব, সাতিশয় পবিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সাতিশয় বলবতী ছিল। সদ্‌গুণে, সদাচরণে, সৎকার্য্যসম্পাদনে, তিনি, রমণীকুলের বরণীয়া ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, দেবসেবার জন্য স্বার্থত্যাগ ও সর্ব্বপ্রকার কষ্টসহিষ্ণুতা এরূপ প্রবল ছিল যে, তিনি, শেষাবস্থায়, যখন জগন্নাথদর্শনে যাত্রা করেন, তখন সঙ্গে, একটি দাসীও লইয়া যান নাই, দুঃখিনীর ন্যায় পদব্রজে বহুদূরবর্ত্তী শ্রীক্ষেত্রে উপনীতা হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে, এক বৎসর, তিনি, প্রত্যহ সম্মার্জ্জনীদ্বারা জগন্নাথদেবের মন্দির পরিষ্কৃত করিতেন। জননীর এইরূপ অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠায়, রামমোহনের হৃদয় ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মাতার সৎকার্য্যে ও সাধু দৃষ্টান্তেই, রামমোহনের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর, রামমোহনের মাতার বৈষ্ণব ধর্ম্মে, কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। একদা, ফুলঠাকুরাণী, কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া, পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন। এই সময়ে, এক দিন, শ্যাম ভট্টাচার্য্য, ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া, রামমোহনের হস্তে, দেবতার নির্ম্মাল্য বিল্বদল সমর্পণ করেন। ফুলঠাকুরাণী আসিয়া দেখিলেন, রামমোহন, সেই বিল্বপত্র চর্ব্বণ করিতেছেন। দেখিয়া, ফুলঠাকুরাণীর বড় ক্রোধ হইল। তিনি, পিতাকে তিরস্কার করিতে করিতে, পুত্রের মুখ হইতে বিল্বপত্র ফেলিয়া, তাহার মুখ ধৌত করিয়া দিলেন। দুহিতার তিরস্কারে ও পবিত্র নির্ম্মাল্যের অবমাননায়, শ্যাম ভট্টা-

চার্য্যের ক্রোধের আবির্ভাব হইল। ক্রোধের আবেগে, ভট্টাচার্য্য, কন্যাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, যে, তুই যেরূপ অবজ্ঞার সহিত, আমার পূজার পবিত্র বিল্বপত্র ফেলিয়া দিলি, সেইরূপ তোর শাস্তি হইবে। তুই, কখনও, এই পুত্র লইয়া, সুখী হইতে পারিবি না, কালে, এই পুত্র বিধর্ম্মী হইবে। পিতার মুখে, এই অভিশাপবাক্য শুনিয়া, ফুলঠাকুরাণী বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। শাপ-মোচনের জন্য, কাতরভাবে পিতার চরণ ধরিয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। তনয়ার কাতরতায়, শ্যাম ভট্টাচার্য্যের ক্রোধ দূর হইল। তিনি, সস্নেহে ফুলঠাকুরাণীকে কহিলেন "আমি যাহা কহিলাম, তাহা, কখনও নিষ্ফল হইবে না, তবে, তোমার এই পুত্র, রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক হইবে।" কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী শ্বশুরালয়ে যাইয়া, স্বামীকে পিতৃশাপের বিষয় কহেন। রামকান্ত ও ফুলঠাকুরাণী, উভয়েই উহাতে বিশ্বাস করিয়া, আপনাদের চিরাচরিত ধর্ম্মপদ্ধতিতে, পুত্রকে আস্থাবান্ করিবার জন্য, যত্ন করিতে থাকেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস, প্রথমে বিফল হয় নাই। অল্প বয়সেই, বৈষ্ণবধর্ম্মে, রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। আপনাদের দেবতা রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের প্রতি, তিনি, যার পর নাই ভক্তি দেখাইতেন, এবং যার পর নাই ভক্তিসহকারে, আপনাদের ধর্ম্মসম্মত ক্রিয়াকাণ্ডনির্ব্বাহ করিতেন। কথিত আছে, তিনি, ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া, জলগ্রহণ করিতেন না। রামকান্ত ও ফুলঠাকুরাণী, তনয়ের এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কৌলিক ক্রিয়ায় আস্থা দেখিয়া, প্রীত হন। পুত্র যে, কালে আপন বংশের ধর্ম্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করিবে, এ দুশ্চিন্তা, তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই।

রামমোহন, প্রথমে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালায়, বিদ্যাশিক্ষা

করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সহিত, অসাধারণ বুদ্ধির সংযোগ থাকাতে, তিনি, অল্প আয়াসে ও অল্প সময়েই, অনেক বিষয় শিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে, পারসী ও আরবী ভাষাতেই, প্রায় সমুদয় কার্য্যনির্ব্বাহ হইত। সুতরাং, ঐ দুই ভাষা আয়ত্ত করা, শিক্ষার্থীদিগের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। রামমোহন, পিতৃগৃহে পারস্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। শেষে, পিতা, তাঁহাকে পারসী ও আরবীতে ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য, পাটনায় পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে, রামমোহনের বয়স বার বৎসর। রামমোহন, দ্বাদশবর্ষবয়সে, পাটনায় যাইয়া, আরবী শিখিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি, তিন বৎসর, তথায় অবস্থিতি করিয়া, ইউক্লিডের জ্যামিতি ও কোরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান আরবী গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক উক্ত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইহার পর, রামকান্ত, পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য, কাশীতে পাঠাইয়া দেন। রামমোহন, কাশীতে উপস্থিত হইয়া, বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে, বেদাদি গ্রন্থ, তাঁহার আয়ত্ত হইল। প্রগাঢ় বুদ্ধি ও অসীম স্মৃতিশক্তিতে, তিনি, প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের সমস্ত শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিলেন। রামমোহন, অল্প সময়ের মধ্যে, শাস্ত্রপারদর্শী হইয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময় হইতে, তিনি, ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা চিন্তা করিতেন। শিক্ষা, তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, তিনি, আরবী ভাষায় মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মৌলবীদিগের সহিত আলাপ করিয়া, মুসলমানধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, কাশীতে যাইয়া, বেদাদিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন; এখন, ধর্ম্মসম্বন্ধে, তাঁহার মত পরি-

বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময়ে, রামমোহনের বয়স ষোল বৎসর। পুত্রের মতপরিবর্ত্তনে, রামকান্তের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। রামকান্ত, পুত্রের উপর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বিরাগের আবেগে, তাঁহার ক্রোধ প্রবল হইল। রামমোহন, গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন।

রামমোহন, ষোল বৎসর বয়সে, গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি, বিভিন্ন প্রদেশের ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার জন্য, নানা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ সুগম হইল। তিনি, ক্রমে হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক তিব্বত দেশে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে, বিদেশে ভ্রমণের কোন সুবিধা ছিল না। নানা স্থানে, দস্যুতস্করের প্রাদুর্ভাব ছিল। বাষ্পীয় শকট বা বাষ্পীয় যান, কিছুই প্রচলিত ছিল না। বাঙ্গালী, তখন বিদেশভ্রমণের নামে, চমকিত হইত। এই দুঃসময়ে, বাঙ্গালার একটি ষোড়শবর্ষীয় অসহায় যুবক, বিপদাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সুদূরবর্ত্তী তিব্বতে যাইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রামমোহন রায়, তিন বৎসর তিব্বতে বাস করেন। ঐ সময়ের মধ্যে, তিনি, বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বশিক্ষা করিয়াছিলেন। তিব্বতবাসিগণ এক সময়ে, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, রামমোহনকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছিল। রামমোহন, কেবল তিব্বতের কোমলহৃদয়া কামিনীগণের স্নেহে, সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই আত্মীয়স্বজনশূন্য, দূরতর দেশে, কেবল নারীজাতিই, তাঁহার সুখ ও শান্তির অদ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ ছিল। রামমোহন, আজীবন নারীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিব্বতবাসিনী, দয়াশীলা রমণীগণ, তাঁহার কোমল হৃদয়ে, যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির বীজ

রোপিত করে, কালক্রমে, সেই বীজ হইতে ফলবান্ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। রামমোহন, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেখাইতে, কখনও বিরত হন নাই। তিনি, স্বদেশে, বিদেশে, স্বপ্রণীত গ্রন্থে বা বন্ধুজনসন্নিধানে, সর্ব্বত্রই, নারীচরিত্রের মহত্ত্ব-কীর্ত্তন করিতেন।

রামমোহন, তিব্বত হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইলেন। রামকান্ত, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, সন্তানবাৎসল্যে, একবারে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই। এখন, রামমোহনকে গৃহে আনিবার জন্য, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একজন লোক পাঠাইলেন। রামমোহন, প্রেরিত লোকের সহিত বিংশতি বর্ষবয়সে, আবাসবাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। রামকান্ত রায়, অপরিসীম আনন্দের সহিত, পুত্ররত্নকে গ্রহণ করিলেন। ফুলঠাকুরাণী, অপরিসীম স্নেহ ও আদরের সহিত, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গৃহে আসিয়া, রামমোহন রায়, বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে, তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিল। রামকান্ত ভাবিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর বিদেশে বহুকষ্টে থাকাতে, পুত্রের সমুচিত শিক্ষা হইয়াছে। পুত্র, এখন বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া, আত্মমতের পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক, সাংসারিক কার্য্যসম্পাদনে, মনোনিবেশ করিবে। কিন্তু, তাঁহার সে আশা দূর হইল। রামমোহনের মত পরিবর্ত্তিত হইল না। রামকান্ত, পুত্রকে, পুনর্ব্বার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি, পুত্রকে এইরূপে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেও, কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতেন।

খ্রীঃ ১৮০৪ অব্দে, রামকান্ত রায়ের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে, রামকান্ত রায়, আপনার সমুদয় সম্পত্তি, তিন পুত্রের মধ্যে, ভাগকরিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, রামমোহন রায়, পিতার মৃত্যুর পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত, ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই। কথিত আছে, রামমোহন, যদিও পিতৃসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তথাপি, আত্মীয়স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া, উহা, স্বহস্তে গ্রহণ করিতে নিরস্ত হন। সমস্ত সম্পত্তিই, তাঁহার মাতা ফুলঠাকুরাণীর তত্ত্বাবধানে থাকে। ফুলঠাকুরাণী, জমীদারী-সংক্রান্ত কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতেন। যাহা হউক, রাম-মোহন, পিতার মৃত্যুর পর, পুনর্ব্বার গৃহে আসিয়া, বাস করিতে লাগি-লেন। এ সময়েও, তাঁহার পাঠানুরাগ পূর্ব্ববৎ প্রবল ছিল। এরূপ গল্প আছে যে, একদা, তিনি, প্রাতঃস্নান করিয়া, একটি নির্জ্জন গৃহে বসিয়া, বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত, মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত সংস্কৃত রামায়ণ, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। রামমোহনের পিতামহ ও পিতা, নবাবের সরকারে চাকরী করিয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ে, শিক্ষিত হইলে, ঐ সকল চাকরী পাওয়া যাইত, রামকান্ত, রামমোহনকে, তদ্বিষয়শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নাই। এ সময়ে, পারস্য ভাষাই অধিকতর চলিত ছিল, এজন্য, রামমোহন, ঐ ভাষাতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তিনি, একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, কিছুই ইঙ্গরেজী শিক্ষা করেন নাই। বাইশ বৎসর বয়সে, ইঙ্গরেজী শিখিতে, তাঁহার ইচ্ছা হয়। পরবর্ত্তী আরও পাঁচ ছয় বৎসর, তিনি, উহাতে মনোযোগ দেন নাই। সাতাশ কি আটাশ বৎসর বয়সে, তিনি ইঙ্গরেজী ভাষায় মনোগত ভাব, সামান্যরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু ভাল করিয়া, ইঙ্গরেজী লিখিতে জানিতেন না।

রামমোহন রায়, এই সময়ে, গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি, রঙ্গপুরের কলেক্টর জন ডিগবি সাহেবের নিকটে, কেরাণী-গিরির প্রার্থী হইলেন। রামমোহন, কর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে, সাহেবের নিকটে, প্রস্তাব করিলেন যে, যখন, তিনি কার্য্যের জন্য, সাহেবের সম্মুখে আসিবেন, তখন, তাঁহাকে আসন দিতে হইবে। আর, সামান্য আমলাদিগের প্রতি, যেরূপ হুকুমজারি করা হয়, তাঁহার প্রতি, সেরূপ করা হইবে না। ডিগ্‌বি সাহেব, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, রামমোহন রায় কর্ম্মগ্রহণ করিলেন। রামমোহন, কিরূপ স্বাধীনপ্রকৃতি ছিলেন, চরিত্রগুণ তাঁহাকে কিরূপ উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা, এই বিবরণে, প্রকাশ পাইতেছে।

রামমোহন রায়, যত্ন ও উৎসাহের সহিত আপনার কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ডিগ্‌বি সাহেব, তাঁহার কার্য্যনৈপুণ্য দেখিয়া, আহ্লাদিত হইলেন। এই সময়ে, দেওয়ানী (জজের ও কলেক্টরের সেরেস্তাদারী, তখন "দেওয়ানী" বলিয়া অভিহিত হইত) আমাদের পক্ষে, উচ্চপদ বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাম-মোহন, স্বীয় দক্ষতা ও বিদ্যাবুদ্ধির বলে, ক্রমে ঐ উন্নত পদে নিযুক্ত হইলেন। রামমোহনের অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়া, ডিগ্‌বি সাহেব, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে, উভয়ের মধ্যে, প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। মৃত্যুপর্য্যন্ত, ঐ বন্ধুতা অবিচ্ছিন্ন ছিল।

রঙ্গপুরের কর্ম্মপরিত্যাগের পর, রামমোহন, কিছু দিন, মুর্ষিদা-বাদে যাইয়া, বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে, তিনি, পারস্য ভাষায়, ধর্ম্মসম্বন্ধে, একখানি গ্রন্থপ্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা, আরবী ভাষায় লিখিত হয়।

মুর্ষিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, রামমোহন রায়, কলিকাতায়

আসিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই, তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত হইল। তিনি, এই বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অকুতোভয়ে, অবলম্বিত ব্রতসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাজসংস্কার, রাজনীতির সংস্কার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি, সকল বিষয়েই, তাঁহার সমান দক্ষতা, সমান একাগ্রতা ও সমান শ্রমশীলতা পরিস্ফুট হইতে লাগিল। রামমোহন রায়, কলিকাতায় আসিলে, কলিকাতার কতিপয় প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিতে লাগিলেন। এই আলাপে, অনেকে, তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া, তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রঘুরাম শিরোমণি প্রভৃতি কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং প্রসিদ্ধ ডেবিড্ হেয়ার ও খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক আডাম্ সাহেব প্রভৃতি সকলেই, তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা আসিতেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি কালে, রামমোহন, পারস্য ভাষায় একখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে, খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের ইঙ্গরেজী অনুবাদপাঠে, তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি, মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য, হিব্রু ভাষা শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যে, ঐ ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রন্থ হইতে খ্রীষ্টের উপদেশগুলির সঙ্কলনপূর্ব্বক এক খানি গ্রন্থের প্রচার করিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, হিব্রুর সহিত আরবীর অতি নিকট সম্বন্ধ। রামমোহন, আরবীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, এ জন্য, মুসলমানেরা তাঁহাকে মৌলবী বলিত। আরবীতে ব্যুৎপত্তি থাকাতে, রামমোহন, অতি অল্প আয়াসেই, হিব্রু ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া, খ্রীষ্টের উপদেশগুলির সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ সহোদর জগন্মোহনের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার স্ত্রী সহমৃতা হন। রামমোহন, স্বয়ং, এই সহমরণের ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। ঐ ভীষণ দৃশ্যে, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়। উহা, তাঁহার মনে, এরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তিনি, কখনও ঐ শোচনীয় কাণ্ড বিস্মৃত হন নাই। যেরূপেই হউক, হিন্দুসমাজ হইতে ঐ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে, তিনি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। সতীদিগকে, যেরূপ বলপূর্ব্বক মৃত পতির সহিত, এক চিতায় দগ্ধ করা হইত, যাহাতে, তাহারা চিতা হইতে উঠিতে না পারে, এজন্য, যেরূপ বলপূর্ব্বক, তাহাদের বুকে বাঁশ চাপাইয়া দেওয়া হইত, যাহাতে, তাঁহাদের মর্ম্মভেদী আর্ত্ত-নাদ, লোকের শ্রুতিপ্রবিষ্ট না হয়, এ জন্য, যেরূপ মহাশব্দে, নানাবিধ বাদ্য বাদিত হইত, তাহা, রামমোহনের অবিদিত ছিল না। রামমোহন, এই প্রথার উচ্ছেদের জন্য, তিন খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যই যে, শ্রেষ্ঠ, তাহা, তিনি অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা, ঐ সকল গ্রন্থে, প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

সতীদাহের বিরুদ্ধে, রামমোহনকে এইরূপ বদ্ধপরিকর দেখিয়া, প্রাচীনমতাবলম্বী হিন্দুগণ, যার পর নাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। এ সম্বন্ধে, রামমোহনের সহিত, তাঁহাদের ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। কিন্তু, রামমোহন, তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইলেন না। তিনি, সময়ে সময়ে, ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া, মৃতপতিক রমণীর সহমরণনিবারণের অনেক চেষ্টা করিতেন। কথিত আছে, কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া একটি মহিলা, সহমৃতা হইবার জন্য, ভাগীরথীতীরে উপনীতা হন। রামমোহন, এই সংবাদ পাইয়া, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং সেই মহি-লাকে, জীবিতা রাখিবার জন্য, তাঁহার আত্মীয়দিগকে শান্তভাবে

বুঝাইতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি, ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া, রামমোহন রায়ের প্রতি কটূক্তি করিলেন। এই অপমানবাক্যেও, রামমোহন, ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি, পূর্ব্বের ন্যায় শান্তভাবে, আত্মপক্ষের সমর্থন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে ভৃত্য ছিল, প্রভুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হওয়াতে, তাহার বড় ক্রোধ হইয়াছিল, কিন্তু, রামমোহন, তাহাকে স্থির থাকিতে, আদেশ দিয়াছিলেন।

এই সময়ে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। কথিত আছে, একদা গবর্ণর জেনেরল, সতীদাহের সম্বন্ধে, রামমোহন রায়ের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য, তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে আনিতে, আপনার এক জন সৈনিক কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। উক্ত কর্ম্মচারী, রামমোহন রায়ের নিকট উপস্থিত হইলে, রামমোহন তাঁহাকে কহিলেন, "আমি এক্ষণে, বৈষয়িক কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া, শাস্ত্রানুশীলনে নিযুক্ত রহিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক লাট সাহেবকে জানাইবেন, আমার রাজদরবারে উপস্থিত হইতে বড় ইচ্ছা নাই।" কর্ম্মচারী, যাহা শুনিলেন, লর্ড বেণ্টিঙ্কের নিকটে যাইয়া, অবিকল তাহাই বলিলেন। গবর্ণর জেনেরল, তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি, রামমোহন রায়কে কি বলিয়াছিলেন।" তিনি, উত্তর করিলেন, "আমি কহিয়াছিলাম, আপনি, গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিত, একবার সাক্ষাৎ করিলে, তিনি, বাধিত হন।" গবর্ণর জেনেরলের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। তিনি, গম্ভীরভাবে পারিষদকে কহিলেন, "আপনি, আবার তাঁহার নিকটে যাইয়া বলুন যে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বড় বাধিত হন।" উক্ত সৈনিক কর্ম্মচারী, আবার রামমোহন রায়ের, নিকটে উপস্থিত

হইয়া, বিনয়ের সহিত, ঐ কথা বলিলেন। ভারতের গবর্ণর জেনেরলের এইরূপ শিষ্টাচারে রামমোহন রায়, যার পর নাই প্রীত হইলেন। তিনি, আর কাল বিলম্ব না করিয়া, গবর্ণর জেনেরলের নিকট যাইয়া, সতীদাহের সম্বন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিলেন। গবর্ণর জেনেরল, সতীদাহপ্রথার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া, ১৮২৯ অব্দে, ঐ প্রথা রহিত করিয়া দিলেন। রামমোহনের কীর্ত্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইল।

সতীদাহপ্রথা উঠিয়া যাওয়াতে, প্রাচীনমতাবলম্বী হিন্দুগণ, অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। চারি দিক হইতে, রামমোহনের উপর গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। কলিকাতার কোন কোন ধনী লোক, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। রামমোহন, ইহাতে শঙ্কিত হইয়া, আপনার পবিত্র কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার হিতৈষী বন্ধুগণ, তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে কহিতেন, এবং বাহিরে যাইতে হইলে, প্রহরী সঙ্গে লইয়া যাইতে, পরামর্শ দিতেন। কিন্তু, রামমোহন কখনও, প্রহরী সঙ্গে লইতেন না। বাহিরে যাইবার সময়ে, তিনি, বক্ষঃস্থলে, পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে, একখানি কিরীচ রাখিয়া, নির্ভয়ে রাজপথে, একাকী ভ্রমণ করিতেন।

রামমোহন রায়ের সময়ে, ইঙ্গরেজীশিক্ষার কোনও সুবিধা ছিল না। রাজপুরুষদিগের এক পক্ষের মত ছিল যে, ভারতবর্ষীয়দিগকে ইঙ্গরেজীশিক্ষা না দিয়া, সংস্কৃত ও পারসীশিক্ষা দেওয়াই উচিত। কিন্তু, অপর পক্ষ ইঙ্গরেজী শিক্ষাদেওয়া, অধিকতর সঙ্গত বলিয়া, নির্দ্দেশ করেন। রামমোহন, এই শেষোক্ত দলের পরিপোষক হইলেন। ইঙ্গরেজীশিক্ষা না করিলে যে, নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতাসংগ্রহ করিতে পারা যাইবে না, ইহাতে, তাঁহার, দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি, ইঙ্গরেজীশিক্ষার সমর্থন করিয়া,

খ্রীঃ ১৮২৩ অব্দে, তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহর্ষ্টকে এক খানি পত্র লিখেন। পত্রখানি ইঙ্গরেজিতে লিখিত হয়। ঐ পত্রে, ইঙ্গরেজীশিক্ষার উপকারিতা, বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। উক্ত পত্র, এরূপ অকাট্য যুক্তিপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত ছিল যে, তৎকালে সুবিজ্ঞ ইঙ্গরেজেরা, উহা পাঠ করিয়া, বিস্মিত হইয়াছিলেন। ঐ পত্র পড়িয়া, অনেকে, রামমোহন রায়ের ইঙ্গরেজীভাষায় অভিজ্ঞতার বিস্তর প্রশংসা করেন। যাঁহারা, ইঙ্গরেজীশিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন, শেষে, তাঁহাদেরই জয়লাভ হয়। ইঙ্গরেজীশিক্ষার জন্য, হিন্দুকলেজ নামে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ হইতে থাকে। ইহাতে, রামমোহন রায়, যার পর নাই আহ্লাদিত হন।

উপস্থিত সময়ে, বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অবস্থা বড় মন্দ ছিল। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে, যে কয়েক খানি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভাষা, এরূপ অপকৃষ্ট ছিল যে, সাধারণে তাহা পড়িতে ইচ্ছা করিত না। রামমোহন রায়ই, বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি করেন। তিনি, ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে, অনেক গুলি গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছিলেন। অপরাপর বিষয়েও কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ ও সরল ছিল। তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। তৎকর্ত্তৃক সংবাদকৌমুদী নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি, সকল বিষয়ই প্রকাশিত হইত। এতদ্ব্যতীত, রামমোহন এক খানি ভূগোল ও একখানি খগোলও লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ঐ পুস্তকদ্বয়, এখন আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ব্রহ্মসঙ্গীতরচনায়, রামমোহন রায়ের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার গীতগুলি এরূপ সুললিত, এরূপ গভীর ভাবপূর্ণ ও এরূপ ঐশ্বরিক তত্ত্বের বিকাশক যে, এক্ষণে, তৎসমুদয়, আমাদের জাতীয় সম্পত্তির মধ্যে, পরিগণিত হইয়াছে। অনেকেই, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীত আদরসহকারে শুনিয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গীতে, অনেক পাষণ্ডের হৃদয়ও আর্দ্র হয়।

এই সময়ে, দিল্লীর সম্রাট, কয়েক বিষয়ে, অধিকারলাভের জন্য, ইঙ্গলণ্ডে আবেদন করিতে, রামমোহনকে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। রামমোহন, সম্রাটের বিষয়, ইঙ্গলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্য, বিলাতযাত্রার অয়োজন করিতে লাগিলেন। যাত্রার দিন, তিনি, তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য, এত লোক হইয়াছিল যে, গৃহের সোপানশ্রেণীতে দাঁড়াইবার অণুমাত্রও স্থান ছিল না। রামমোহন রায়, সকলের নিকট বিদায় লইয়া, খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে, ১৫ই নবেম্বর, সমুদ্রপোতে আরোহণ করিলেন। জাহাজে, রামমোহন রায়, নিজের কামরায় আহার করিতেন। রন্ধনের জন্য, স্বতন্ত্র স্থান না থাকাতে, প্রথমে বড় অসুবিধা হইয়াছিল। একটি মাত্র মৃণ্ময় চুল্লীতে পাক হইত। তাঁহার ভৃত্যেরা, সমুদ্রপীড়ায় কাতর হইয়া, তাঁহার কামরায় শয়ন করিয়া থাকিত। তিনি এমন সদয়প্রকৃতি ও ভৃত্যবৎসল ছিলেন যে, ভৃত্যদিগকে, কখনও স্থানান্তরিত করিতে, ইচ্ছা করিতেন না; নিজে, অন্য স্থানে, অতি কষ্টে শয়ন করিয়া থাকিতেন। জাহাজের যাত্রিগণের সকলেই, রামমোহনের উদার প্রকৃতি ও সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া এরূপ প্রীত হইয়াছিল যে, কেহই, তাঁহার সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিত না। সকলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে ব্যগ্র থাকিত। ঝটিকা উপস্থিত হইলে, তিনি, জাহাজের

উপর দাঁড়াইয়া, স্থিরভাবে প্রকৃতির অসীমশক্তি ও সুদূরপ্রসারিত, শুভ্রফেণমালাশোভিত, সুনীল সাগরের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের গুণগান করিতেন।

৪ মাস ২৩ দিনে, জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। রামমোহন রায়, প্রথমে লিবরপুল নগরে উপস্থিত হইলেন। বিলাতের অনেক প্রধান প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। অনেকের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে, তাঁহার বাদানুবাদ হইতে লাগিল। ইঙ্গলণ্ডের জ্ঞানিগণ, তাঁহার বিচারনৈপুণ্য, বাক্‌পটুতা, উদার ভাব, ও জ্ঞানগরিমায়, এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ইঙ্গলণ্ডের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী বেন্থাম সাহেব, তাঁহাকে, মানবজাতির হিতসাধনব্রতে, তাঁহার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়সহযোগী বলিয়া, নির্দ্দেশকরিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

রামমোহন রায়, লিবরপুল, লণ্ডন ও মাঞ্চেষ্টর নগরে, কিছু কাল, অবস্থিতি করেন। তিনি, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধে, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিয়োজিত সমিতিতে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঙ্গলণ্ডের অধিপতি, তাঁহাকে আদরসহকারে গ্রহণ করেন। রামমোহন, ইঙ্গলণ্ড হইতে ১৮৩২ অব্দের শরৎকালে, ফরাসীদেশ দর্শন করিতে, যাত্রা করেন। ফ্রান্সের তদানীন্তন সম্রাট, তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি, রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। ফ্রান্সের অনেক রাজপুরুষ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি, রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিতে বিস্মিত হইয়া, তাঁহার সমুচিত সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়, ইহার পর আবার ইঙ্গলণ্ডে উপনীত হইয়া, ব্রিষ্টল

নগরে, একটি উদ্যানপরিবেষ্টিত সুন্দর ভবনে আসিয়া, বাস করেন। এই স্থানে, ব্রিষ্টলের পণ্ডিতগণগুলীর সহিত ভারতবর্ষের রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সম্বন্ধে, তাঁহার আলাপ হয়। পণ্ডিতগণ, যে সকল কঠিন প্রশ্ন করেন, রামমোহন রায়, তিন ঘণ্টাকাল, সমভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তৎসমুদয়ের সদুত্তর দিয়াছিলেন। ইহাই, রাম মোহনের জীবনের শেষ ঘটনা। ইহার পরেই, রামমোহন, ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন।

খ্রীঃ ১৮৩৩ অব্দের ১৯এ সেপ্টেম্বর, রামমোহন রায়ের জ্বর হইল। ঐ জ্বরের ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে বিকার উপস্থিত হইল। প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরা, যত্নের সহিত, তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। ভারতহিতৈষী ডেবিড হেয়ারের কন্যা কুমারী হেয়ার, দিবারাত্রি, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ২৭এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সকল শেষ হইল। রাত্রি দুইটা পনর মিনিটের সময়ে, ভারতের প্রধান পুরুষ, বহুদূরদেশে, ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার মৃত শরীরে যজ্ঞো-পবীত ছিল। সেই উদ্যানপরিবেষ্টিত স্থানের একটি নির্জ্জন বৃক্ষবাটিকায়, তাঁহার দেহ সমাহিত হইল।

রামমোহন রায়, দিল্লীর সম্রাটের নিকট 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি, সম্রাটের যে কার্য্যের জন্য, বিলাতে গিয়াছিলেন, সে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক, দূরদর্শী, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, তাঁহার অসাধারণ গুণের, কখনও অবমাননা করেন নাই। তিনি, যে স্থানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই, তাঁহার প্রতি, যথোচিত সম্মান ও আদর প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার যেরূপ মানসিক ক্ষমতা, সেইরূপ শারীরিক বল ছিল। দুঃখীদিগের প্রতি, তাঁহার যথোচিত

সমবেদনা ছিল। একদা, তিনি চোগা চাপকান পরিয়া, পদব্রজে কলিকাতার রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে, দেখিলেন, এক জন তরকারীওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া, আর উহা তুলিতে পারিতেছে না। তিনি, তৎক্ষণাৎ তাহার মোটটি, মাথায় তুলিয়া দিলেন। আর এক দিন, রামমোহন রায়, কলিকাতার মুটিয়াদের অবস্থা জানিবার জন্য, কোন মুটিয়ার সহিত বসিয়া, আগ্রহসহকারে আলাপ করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়, কোমলমতি বালকদিগের সহিত আমোদ করিতে, বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাটীতে, একটি দোল্‌না ছিল। বালকেরা ঐ দোল্‌নায় বসিলে, তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে দোলাইতেন; পরে, 'এখন আমার পালা' বলিয়া, নিজে দোল্‌নায় বসিতেন। বালকেরা, উল্লাসের সহিত তাঁহাকে দোলাইত। তাঁহার বাবরী চুল ছিল। তিনি, প্রতিদিন স্নান করিয়া, দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া, অনেকক্ষণ কেশবিন্যাস করিতেন।

রামমোহন রায়, অধিক ভোজন করিতে পারিতেন। তাঁহার ভোজনের সম্বন্ধে, অনেক গুলি গল্প প্রচলিত আছে। ঐ সকল গল্পে জানা যায়, তিনি একাকী একটি ছাগের সমুদয় মাংস-ভোজন ও সমস্ত দিনে বারসের দুগ্ধপান করিতে পারিতেন। একদা পঞ্চাশটি আম্র দিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে, তিনি, একটি সুপরিচিত লোকের বাসায় গিয়া, প্রায় এক কাঁদি নারিকেলভক্ষণ করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রামমোহনের মাতা, তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। মাতৃকর্ত্তৃক তাড়িত হইলেও, রামমোহন, মাতার প্রতি, কখন অসম্মানপ্রদর্শন করেন নাই। কিছু কাল পরে, ফুলঠাকুরাণী, পুত্রের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া,

তাঁহার সহিত মিলিত হন, এবং জগন্মোহন, রামলোচন ও রামমোহনের পুত্রদিগের মধ্যে, জমীদারী, ভাগ করিয়া দিয়া, স্বয়ং জগন্নাথদর্শনে গমন করেন।

অসাধারণ সহিষ্ণুতা, অসাধারণ উদারতা ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে, রামমোহন রায়, সমস্ত সভ্যজনপদবাসীর বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

প্রাচীন আর্য্যসমাজ।

বৈদিক কালের পরবর্ত্তী সময়ে, প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে, আর্য্যেরা বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। আর্য্যভূমি, নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কেহই, কোন সময়ে, সকলের উপর আধিপত্যবিস্তার করিতে পারেন নাই। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্য থাকাতে, একটি সুবিধা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, বৃহৎ রাজ্য অপেক্ষা, ক্ষুদ্র রাজ্যে, সভ্যতার ও সুনিয়মের শীঘ্র শীঘ্র উৎকর্ষ হয়। সুতরাং, সভ্যতার প্রথম অবস্থায়, বৃহৎ ভূখণ্ডে খণ্ডরাজ্য থাকা ভাল। উপস্থিত সময়ে, আর্য্যাবর্ত্তে এইরূপ খণ্ড রাজ্য সকল থাকাতে, আর্য্যসভ্যতা শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

রাজারা, প্রাচীরবেষ্টিত রাজধানীতে থাকিয়া, যথানিয়মে, রাজ্যশাসন করিতেন। প্রজাপালন, করসংগ্রহ ও দেশরক্ষা ভিন্ন, তাঁহাদের আর কোন, গুরুতর কার্য্য ছিল না। তাঁহারা, সময়ে সময়ে, মৃগয়ায় যাইতেন। প্রজারা, সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত।

রাস্তা ঘাটসকল পরিস্কৃন্ন ছিল। নগরের রাস্তায় জল দিবার জন্য, লোক সকল নিয়োজিত থাকিত। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। শূদ্রের অবস্থা,, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছিল। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে, নানাপ্রকার বাণিজ্য ও বিলাসদ্রব্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৃষিকার্য্যের অবস্থা, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। হিন্দুকুশের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে স্বর্ণখচিত শাল ও বন্য মার্জ্জার প্রভৃতির কোমল চর্ম্ম,গুজরাটে কম্বল, কর্ণাট ও মহীশূরে মসলিন, বাঙ্গালায় হাতীর গদির চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এতদ্ব্যতীত তিব্বত, চীনপ্রভৃতি দেশ হইতে, পশমী ও রেসমী কাপড় আসিত। রাজসূয় যজ্ঞে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিবার জন্য,ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজারা,আপন আপন দেশের দ্রব্য, সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ক্ষেত্রের চারিদিকে খাল থাকিত, কৃষিজীবীরা এই খালের জল, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, সেচন করিত।

এই সময়ে, অনার্য্যদিগের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছিল। পূর্ব্বে, শূদ্রেরা কেবল দাসত্বে নিযুক্ত থাকিত। কিন্তু, সময়ে এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্ত হয়। সময়ে, শূদ্রেরা আর্য্যদের সহিত মিশিয়া, আপনাদের প্রাধান্য দেখাইতে থাকে। রামায়ণ ও মহাভারতে, অনার্য্যদিগের উৎকর্ষের অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বৈদিক সময় হইতে, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের সময় পর্য্যন্ত, অনার্য্যেরা, আপনাদের দাসত্বশৃঙ্খলবিমোচন ও আচারব্যবহারে,আপনাদিগকে আর্য্যদিগের সহিত এক শ্রেণীতে স্থাপিত করিবার জন্য, অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা করে। এই সময়ে, ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস, কেবল অনার্য্যদিগের এই অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার বিবরণে পূর্ণ রহিয়াছে। অনার্য্যদিগের চেষ্টা বিফল হয় নাই। তাহারা সরলতা ও সৎকার্য্যে, আর্য্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া, আপনাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করে। অনেকে,

বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; অনেকে, কৃষিকার্য্য করিয়া, জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকে। শেষে, শূদ্রগণ "বৃষল" অর্থাৎ কৃষক নামে অভিহিত হয়। কালে, এই বৃষলগণ, প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে, আপনাদের আধিপত্যবিস্তার করিয়াছিলেন।

আর্য্যেরাও, শূদ্রদিগের উৎকর্ষপ্রাপ্তির উপায়বিধানে, উদাসীন থাকেন নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনে, হিন্দু আর্য্যসমাজে, উদারতা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই উদারতাগুণে, হিন্দু আর্য্যসমাজ, সচ্চরিত্র, সদাশয় ও সৎকর্ম্মশীল শূদ্রকেও, আপনাদের শ্রেণীতে নিবেশিত করিতেন। সাধুতার উপর, আর্য্যদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মণ, সাধুতা হইতে স্খলিত হইলে, শূদ্রের শ্রেণীতে স্থান পাইতেন; শূদ্র, সাধুতা দেখাইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইত। মনু কহিয়াছেন, "শূদ্র, ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানের সম্বন্ধেও, এই প্রকার জানিবে।" প্রাচীন আর্য্যদিগের অন্যান্য গ্রন্থেও এবিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, "শূদ্র, শুভ কর্ম্ম ও শুভ আচরণ করিলে, ব্রাহ্মণ হন, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে, ক্ষত্রিয় হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ, অসচ্চরিত্র হন, তিনি, ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে শূদ্রসন্তান, জিতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধচিত্ত, তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়। উত্তম কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ ও উত্তমের সন্তান হইলেই, ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রদ্বারা, সকলে ব্রাহ্মণ হয়। অতএব, শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে, ব্রাহ্মণত্ব পাইয়া থাকে।" উদারহৃদয়, বিশুদ্ধমতি, আর্য্যগণ, উদারতা ও বিশুদ্ধতার দিকে, কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা, ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে। লোমহর্ষণ সূতজাতীয় হইয়াও, প্রাচীন আর্য্যসমাজের ঋষি-

দিগের সাতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। ঋষিগণ, ইঁহার পুত্র সৌতিকে, মহাভারতবক্তার পদে, নিযুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

ক্ষত্রিয়েরা, রাজ্যশাসনের ভারগ্রহণ করিলেও, সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্রাহ্মণগণ, ব্যবস্থাপ্রণয়ন করিতেন। তাঁহারা, সন্ধিবিগ্রহের মন্ত্রণাদাতা, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের পরামর্শদাতা ও সমুদয় সাংসারিক কার্য্যের ব্যবস্থাপক ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ, এইরূপ ক্ষমতাপন্ন হইলেও, আপনাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সভ্যতা পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করে, তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য জাতিকে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের মহিমায়, গৌরবান্বিত করিয়া তুলে। অসীম ক্ষমতাপন্ন হইলেও, ব্রাহ্মণঋষিরা বিষয়নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁহারা, লোকালয়ের নিকটে, সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেন, এবং পরান্নভোজী হইয়া, কেবল শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রপ্রচারে ব্যাপৃত থাকিতেন। এইরূপ বিষয়নিস্পৃহও এইরূপ স্বার্থত্যাগী হইয়া, ঋষিরা, এক সময়ে,জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোকে, চারি দিক উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষার ভার ক্ষত্রিয়ের উপর সমর্পিত ছিল। ক্ষত্রিয় অপ্রমত্ত হইয়া, ব্রাহ্মণের পরামর্শানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রজাপালন করিতেন। পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যে বৈশ্যেরা, লিপ্ত ছিল। বাণিজ্যব্যবসায়ের সুবিধার জন্য, ইহাদিগকে বিভিন্ন দেশের ভাষা আয়ত্ত রাখিতে হইত। শূদ্রের অবস্থা যে, উন্নত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শূদ্রেরা, শিল্প ও কৃষিকার্য্য করিত।

আর্য্যদিগের রাজনীতি, উচ্চভাবে পূর্ণ ছিল। রাজনীতির

এই উপদেশ ছিল যে, রাজারা ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হইবেন না; রাজকার্য্যে আলস্য করিবেন না; ক্রোধের বশীভূত থাকিবেন না; দেশকালাভিজ্ঞ, সাহসী, লোভশূন্য, জ্ঞানী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তিকে, দূতপদে নিযুক্ত করিয়া, ভিন্নদেশের কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন; আত্মানুরূপ, বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায়, ঔদাসীন্য দেখাইবেন না; আবশ্যক হইলে, কৃষকদিগকে, অল্প সুদে, প্রয়োজনের অনুরূপ অর্থ, ঋণ দিবেন; গূঢ় মন্ত্রণা সকল, জনপদমধ্যে প্রচারিত করিবেন না; স্বল্পায়াসসাধ্য, মহোদয় কার্য্য সকল, শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিবেন; কোন বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, ধর্ম্মজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদ্বারা, সেই বিষয়ের বিচার করিয়া দেখিবেন; দুর্গ সকল, ধন, ধান্য ও জলাশয়ে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবেন; শিল্পিগণ ও সৈনিক পুরুষ সকল, সর্ব্বদা, সাবধানে তথায় অবস্থিতি করিবে। রাজা, কঠোরদণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিবেন না; যথাসময়ে সৈন্যদিগকে বেতন দিবেন, যেহেতু, যথাসময়ে বেতন না দিলে, সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না, এবং পদে পদে বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকে; সৎকুলজাত, প্রধান প্রধান লোককে আপনার অনুরক্ত রাখিবেন; যে সকল লোক, রাজার উপকারের জন্য, কালগ্রাসে পতিত, বা যার পর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের পুত্র, কলত্রপ্রভৃতির ভরণপোষণ করিবেন; শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া, আপনার বলাবলের পরীক্ষা করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে আক্রমণ করিবেন; যুদ্ধযাত্রার সময় সৈন্যদিগকে অগ্রিম বেতন দিবেন; বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে, আপনার অধিকার সুরক্ষিত করিয়া রাখিবেন; পরাজিত শত্রুদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন; পিতা মাতা, যেমন আপনার সকল সন্তানের প্রতিই সমান ভাবে স্নেহ প্রকাশ করেন, তিনিও, তেমন, পৃথিবীর সকলের প্রতি, সমান স্নেহ দেখাইবেন; আয়ব্যয়ের গণ-

নায় নিযুক্ত লেখকগণ, রাজার আয়ব্যয়, পূর্ব্বাহ্ণে নিরূপিত করিয়া রাখিবে। রাজা, রাজ্যস্থ কৃষকদিগকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবেন; রাজ্যের স্থানে স্থানে, সলিলপূর্ণ, বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকল নিখাত করাইবেন, যেন কৃষকগণ সর্ব্বদা বৃষ্টির অপেক্ষায় না থাকে। দুর্ব্বল শত্রুকে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করিবেন না; যথা-কালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেশভূষা করিয়া, মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাদিগকে দর্শন দিবেন; দুষ্ট, অহিতকারী, দণ্ডার্হ তস্করদিগকে ক্ষমা করিবেন না। এগুলি যে, উৎকৃষ্ট রাজনীতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর্য্যগণের রাজনীতির অনেক বিষয়, বর্ত্তমান সময়ের রাজগণেরও অনুকরণীয়।

রাজনীতির ন্যায় হিন্দুদিগের ধর্ম্মনীতিও, উচ্চভাবে পূর্ণ ছিল। আর্য্যেরা, অহিংসা, সত্যবচন, সর্ব্বজীবে দয়া, শম ও যথাশক্তি দান, এই কয়েকটি, গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের মতে, এই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, এবং পরদারবিরতি, গৃহীত স্ত্রীর পরিরক্ষণ, অদত্ত দ্রব্যের গ্রহণে বিরতি, ও মদ্যমাংসের পরিত্যাগ, এই পাঁচটি প্রধান ধর্ম্মনীতিসম্মত কার্য্য ছিল। এই পঞ্চ ধর্ম্ম, বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ, সর্ব্বদা অতন্দ্রিত হইয়া, বহুশাখাযুক্ত ধর্ম্মনীতির সম্মানরক্ষা করিতেন।

আর্য্যদিগের এই ধর্ম্মনীতি, সকল বিষয়েই উন্নত অবস্থার পরিচয় দিতেছে। আর্য্যেরা সন্তোষ ও সহিষ্ণুতার সম্বন্ধে, সাধুতা ও মহত্ত্বের সম্বন্ধে, তেজ ও ক্ষমার সম্বন্ধে, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সম্বন্ধে এবং নারীধর্ম্ম, আচারব্যবহার প্রভৃতির সম্বন্ধে, উৎকৃষ্ট নীতি সকল নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল নীতির উপদেশ এই, সমভাবে উপস্থিত সুখ দুঃখের বহন করিবে, যাহার মন পরিতুষ্ট, সকলই, তাহার নিকট সম্পত্তীভূত হয়। যে পরিমাণে, কেহ উপকার করে,

তাহা অপেক্ষা, অধিকপরিমাণে, তাহার প্রত্যুপকার করিবে। যাহাদের অন্নভোজন, ও যাহাদের আলয়ে বাস করিতে হয়, কখনও, তাহাদের অনিষ্ট করিবে না। নিয়তই উদ্যত থাকিবে, কোনও ক্রমে অবনত হইবে না। সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞাবলে বশীভূত করিবে, ক্ষমাপর ব্যক্তিরা ইহলোকে সম্মান, পরলোকে শ্রেয়োলাভ করেন। কর্ম্ম করিয়া, পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হইলেও, কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। পুরুষ অশক্ত বলিয়া, কখনও আপনার অবমাননা করিবে না, যেহেতু, আত্মাবমানী ব্যক্তি, কখনও ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে না। ইহার পর, নারীধর্ম্মের সম্বন্ধে লিখিত আছে, স্ত্রী, সর্ব্বদা প্রহৃষ্টা থাকিবে, গৃহকর্ম্মে দক্ষা হইবে, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কৃত রাখিবে, ব্যয় বিষয়ে অমুক্তহস্ত হইবে, পরিজনবর্গকে ভোজন করাইয়া, শেষান্ন আপনি ভোজন করিবে। আচারব্যবহার ও অতিথি-সংকার প্রভৃতির সম্বন্ধেও, হিন্দুদিগের বিশেষ উদারতা ছিল। এ সম্বন্ধে, তাঁহাদের উপদেশ এই, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ ও ভৃত্যবর্গ, ইহাদের সহিত কখন বিবাদ করিবে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র, আপনার শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ ছায়ার স্বরূপ, আর দুহিতা পরম কৃপার পাত্রী। পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবে, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবে, এবং তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। যেখানে স্ত্রীলোকেরা আদৃতা হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন, যেখানে নারীদিগের অনাদর, সেখানে সকল সৎকার্য্য নিষ্ফল হয়। ধর্ম্ম-সঙ্গত উপায়ে, যে ধনলাভ হয়, তাহাকেই যথার্থ ধন বলে। কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য, অতিথিকে না দিয়া আপনি ভোজন করিবে না, অতিথিসেবা দ্বারা, ধন, যশ, আয়ু ও স্বর্গলাভ হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিও, হিন্দুদিগের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহারা কহিয়াছেন,

অতিথিশালানির্ম্মাণ, মূত্রাদিত্যাগ, পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য-নিক্ষেপ, এগুলি, আবাসগৃহ হইতে, দূরে করিবে। জলে, মূত্র, বিষ্ঠা বা নিষ্ঠীবনত্যাগ ও মলমূত্রাদিদূষিত বস্ত্রক্ষালন করিবে না, কিংবা, রক্ত বা কোন প্রকার বিষনিক্ষেপ করিবে না। দেহরক্ষার জন্য, পরিষ্কৃত জল বড় প্রয়োজনীয়। পানীয় জল অবিশুদ্ধ হইলে নানা রোগের উৎপত্তি হয়। আর্য্যগণ, ইহা জানিতেন, এই জন্য, তাঁহারা পানীয় জল, পবিত্র রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। অপরের গলগ্রহ হওয়া, অধিক কি, কোন উপাদেয় দ্রব্য পরিজনবর্গকে না দিয়া, একাকী ভোজনকরাও, আর্য্যেরা, ঘোরতর পাপের মধ্যে গণনা করিতেন। একদা, কোন মুনি, আপনার মৃণালগুলি, কোন এক ঘাটে রাখিয়া স্নান করিতেছিলেন, স্নানের পর উঠিয়া দেখিলেন, সমুদয় মৃণাল অপহৃত হইয়াছে। তখন, সেই ঋষি, সমভিব্যাহারী ঋষিদিগকে মৃণালের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, ঋষিগণ কঠিন শপথ করিয়া, আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া, প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক জন বলিলেন, যে, আপনার মৃণাল লইয়াছে, সে, ভার্য্যার উপার্জ্জিত অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করুক, শ্বশুরের অন্ন খাইয়া জীবিত থাকুক। আর এক জন কহিলেন, যে, আপনার মৃণাল লইয়াছে, সে উপাদেয় দ্রব্য একাকী ভোজন করুক। প্রাচীন হিন্দুগণ, এইরূপ সরল ও উদার ছিলেন। এইরূপ সরলতা ও উদারতা, তাঁহাদের ধর্ম্মনীতিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। বোধ হয়, কোন দেশের কোন সভ্য জাতি, ধর্ম্মনীতির উচ্চতায়, প্রাচীন হিন্দুদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

হিন্দু মহিলারা, আদর ও সম্মানের পাত্রী ছিলেন। গৃহস্বামী বিশ্বস্তা কিঙ্করীরও, কোনরূপ অসম্মান করিতেন না। যুধিষ্ঠির, আপনার কিঙ্করীকে “ভদ্রে” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পর-

স্পরের প্রতি কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময়, অগ্রে স্ত্রীলোকের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইত। ভরত, বনপ্রবাসী রামচন্দ্রের নিকটে গেলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাক ত?" ধৃতরাষ্ট্রও, এইরূপ, এক সময়ে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন, "রাজ্যের দুঃখিনী অঙ্গনারা ত, উত্তম রূপে রক্ষিত হইতেছে? রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ত, সম্মান প্রদর্শিত হয়?" যে স্ত্রীলোকের দ্রব্য অপহরণ, কি, বিবাহিতা বা অবিবাহিতা, নারীর বিশুদ্ধ চরিত্রে দোষারোপ করিত, তাহার গুরুতর দণ্ড হইত।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য, এই চারি আশ্রম, প্রাচীন হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। এই চারি আশ্রমের মধ্যে, ব্রাহ্মণকে চারিটি, ক্ষত্রিয়কে তিনটি, বৈশ্যকে দুইটি, ও শূদ্রকে ঐ চারিটির কোন একটির, যথাবিধি প্রতিপালন করিতে হইত। প্রাচীন হিন্দুগণ, কিরূপে আপনাদের পবিত্রতাময় সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিতেন সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া, সমাজের উপকারের জন্য, আপনাদের জীবন, কিরূপ কঠোর ব্রতময় করিয়া তুলিতেন, এবং আপনাদের ধর্ম্মে, কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা দেখাইতেন, তাহা, এই চারি আশ্রমের বিষয়ের আলোচনা করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রথম আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য, সকল আশ্রমের আদি। আর্য্যের, ধর্ম্মমন্দিরে আরোহণের প্রথম সোপান, ব্রহ্মচর্য্য। বীজ, উপযুক্ত রস ও তাপের সাহায্যে, যেমন ফলধারণক্ষম বৃক্ষে পরিণত হয়, হিন্দু বালক, তেমনই ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে, গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের অধিকারী আর্য্য নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। বাল্যকালে, হৃদয়ে যে ভাব প্রবেশ করে, বয়োবৃদ্ধির সহিত, ক্রমে তাহার বিকাশ হইতে থাকে। শৈশবের জ্ঞান, শৈশবের শিক্ষা,

শৈশবের ধারণা, চিরকাল হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। প্রস্তরে খোদিত রেখা, যেমন সহজে বিলুপ্ত হয় না, শিশুকালের শিক্ষাও, তেমনই সহজে হৃদয় হইতে দূর হয় না। এই জন্য, আর্য্যসমাজে বাল্যকালেই, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রতিপালনের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যাহাতে, পরমধার্ম্মিক, উপযুক্ত গৃহস্থ হওয়া যায়, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে, প্রধানতঃ তাহারই শিক্ষা দেওয়া হইত। আর্য্যসন্তানের পঞ্চম অথবা অষ্টম বর্ষ হইতে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হইত। এই সময়ে তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ গৃহ হইতে, গুরুসন্নিধানে গমন করিতে হইত। একটি বা সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করাই, তাঁহার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বেদের নাম ব্রাহ্মণ হওয়াতে, তিনি ব্রহ্মচারী অথবা বেদশিষ্য বলিয়া উক্ত হইতেন। শিক্ষালাভ করিতে ন্যূনকল্পে বার বৎসর ও ঊর্দ্ধসংখ্যায় আট-চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইত। গুরুগৃহে বাসকালে, কোমল-মতি, তরুণবয়স্ক ছাত্রকে অতি কঠিন নিয়মাবলীর অধীন হইয়া চলিতে হইত। তিনি, প্রতিদিন দুই বার, অর্থাৎ সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ে সন্ধ্যা করিবেন। প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, তাঁহাকে ভিক্ষার্থ পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। তিনি, এই ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্যই গুরুর হস্তে দিবেন। গুরু, যাহা খাইতে দেন, তদ্ভিন্ন, তিনি, আর কিছুই খাইতে পাইবেন না। তাঁহাকে জল আনয়ন, যজ্ঞের জন্য সমিধ আহরণ, হোম-স্থান পরিষ্কার ও দিবারাত্রি গুরুর পরিচর্য্যা করিতে হইবে। এই সকল কঠোর নিয়মানুষ্ঠানের বিনিময়ে, গুরু, তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিবেন। এই বেদ, যাহাতে কণ্ঠস্থ হয়, এবং যাহাতে তিনি, দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, উপযুক্ত গৃহস্থ হইতে পারেন, গুরু, তাঁহাকে তদ্বিষয়ের, উপযোগী শিক্ষা দিতে ত্রুটি করি-

বেন না। ব্রহ্মচারী বালককে মিতাহারী ও মিতাচারী হইয়া অতি কষ্টে, কঠোর ব্রতের প্রতিপালন করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিয়া, ইন্দ্রিয়সংযম করিবেন, সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা ও প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্যগীত, বাদ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি, ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিবেন। তাঁহাকে, দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, ও পরের অপকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি আচার্য্যের সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া দিবেন, প্রতিদিন স্নান করিবেন, শুচি হইয়া, দেব, ঋষি, পিতৃলোকের তর্পণ ও দেবার্চ্চনা করিবেন। এইরূপ কষ্টসহিষ্ণু, এইরূপ আত্মসংযত, ও এইরূপ ভোগবিলাসপরিশূন্য হইয়া, তরুণবয়স্ক ব্রহ্মচারী দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ শিক্ষা করিতেন। উক্ত দশপ্রকার ধর্ম্মলক্ষণ এই :—ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ। প্রাচীন আর্য্যসমাজে পবিত্রস্বভাবশিক্ষার্থী, গভীর ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতালাভের উদ্দেশ্যে, সমুদয় ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকিয়া, এই দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ শিক্ষা করিতেন।

ব্রহ্মচারী দুই প্রকার :—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। যাঁহারা দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া, যথানিয়মে দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ শিক্ষা পূর্ব্বক বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, গৃহস্থ হইতেন, তাঁহাদের নাম উপকুর্ব্বাণ, আর, যাঁহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া, বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হইয়া, কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ঈশ্বরের চিন্তাতেই, নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া উক্ত হইতেন।

বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে, স্বাস্থ্যের বিশিষ্ট প্রয়োজন। শরীর রুগ্ন হইলে, কোনও কার্য্যে, মনুষ্যের প্রবৃত্তি থাকে না। এই জন্য,

প্রাচীন আর্য্যগণ স্বাস্থ্যের দিকে, সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। ব্রহ্মচারী, প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, শয্যা ত্যাগ করিতেন, স্নান করিয়া শুচি হইয়া, যজ্ঞকাষ্ঠ আনিতেন, হোমস্থান পরিষ্কৃত করিতেন, এবং যথানিয়মে গুরুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্যে, তাঁহার শরীর দৃঢ় ও সবল হইত। সে সময়ে শিক্ষার্থীর বিলাসিতা ছিল না। সৌখীনতা পরিহার করিয়া, পার্থিব বিষয়লালসা হইতে দূরে থাকিয়া, তিনি, শারীরিক পরিশ্রমের বলে, সমুদয় কার্য্য করিতেন। সুতরাং, জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত, তাঁহার দৈহিক বলের বিকাশ হইত। স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকিত। এতদ্ব্যতীত, শিক্ষার্থীর যে যে গুণ থাকা উচিত, ব্রহ্মচারী, তৎসমুদয়ে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত হইতেন। তিনি ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকিতেন, চিত্তসংযমে পারদর্শী হইতেন, নিষ্ঠাবান হইয়া দেবারাধনা, অধ্যয়ন ও গুরুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ব্রহ্মচারীকে, পঞ্চম বা অষ্টমবর্ষ বয়স হইতেই, অনেক ভার ঠেলিয়া, অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, অনেক বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া, চিত্তসংযম অভ্যাস করিতে হইত। তাঁহার জীবন কঠোর তপস্যাময় ছিল। তিনি, এই তপস্যার বলে, পরে, গৃহস্থ হইয়া, সংযতভাবে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, এই তপস্যার বলে, পবিত্র মানব নামের যোগ্য হইয়া উঠিতেন, এবং এই তপস্যার বলে, কি বিষয়ক্ষেত্রে কি ধর্ম্মরাজ্যে, সর্ব্বত্রই, সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অদ্বিতীয় পাত্র হইতেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, আয়োদধৌম্যনামক কোন শিক্ষাগুরুর উপমন্যু নামে এক জন শিষ্য ছিল। উপমন্যু, ভিক্ষালব্ধ অন্নে, উদরপূর্ত্তি করিয়া, বিদ্যাভ্যাস করিতেন। গুরু, শিষ্যের কঠোর কষ্টসহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহাকে ভিক্ষান্ন

গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। উপমন্যু, গুরুর আদেশে কিছু-মাত্র দুঃখিত হইলেন না, পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া, বিদ্যা-ভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু, ইহা শুনিয়া, তাঁহাকে দুগ্ধ পান করিতেও নিষেধ করিলেন। উপমন্যু, দুগ্ধপানসময়ে, বৎসের মুখ দিয়া, যে ফেন, বাহির হইত, তাহাই পান করিয়া, গুরুর আদেশপালন করিতে লাগিলেন। গুরু, অতঃপর, তাঁহাকে উহা পান করিতেও বারণ করিলেন। উপমন্যু, তখন বৃক্ষপত্র খাইয়া, ভক্তিভাবে গুরুর পরিচর্য্যা ও সংযতচিত্তে বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কষ্ট-সহিষ্ণুতার কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত! কঠোর ব্রতাচরণের কি জ্বলন্ত উদাহরণ! এই শিক্ষার বলেই, হিন্দুগণ, পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, বরণীয় দেবতার ধ্যান করিতে করিতে, স্বর্গীয় আনন্দের উপভোগ করিতে পারিতেন। এই শিক্ষার বলেই, হিন্দুগণ সংসার-ক্ষেত্রে থাকিয়া, লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে সক্ষম হইতেন। এই শিক্ষার বলেই, হিন্দুগণ, সমুদয় মলিনতা, সমুদয় পঙ্কিলভাব ও সমুদয় সাংসারিক প্রলোভন পরিহার করিতেন। যাঁহার হৃদয় এই শিক্ষায় বলীয়ান্ হইত, তিনিই, প্রকৃত আর্য্য, তিনিই, প্রকৃত হিন্দু, তিনিই, প্রকৃত ধার্ম্মিক ছিলেন।

দ্বিতীয় আশ্রম, গার্হস্থ্য। ব্রহ্মচারী, যথানিয়মে বিবাহ করিয়া, দ্বিতীয় অর্থাৎ গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে, গৃহস্থ বা গৃহমেধী বলিয়া উক্ত হইতেন। গৃহস্থ, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মপালন করিয়া, নিষ্ঠাবান্ আত্মসংযত, বিলাসবিদ্বেষী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছেন। সুতরাং, সংসার, তাঁহার নিকটে, চিরপবিত্রতাময় ধর্ম্মাচরণের অপূর্ব্ব ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এ সময়ে, তিনি, বৈদিক স্তোত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, তাঁহার অধীত হইয়াছে। তিনি, সমুদয় যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে, বাধ্য হইয়াছেন। তিনি, কোন কোন

উপনিষদও অভ্যাস করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ প্রসারিত হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, এই দ্বিতীয় আশ্রম, তাঁহাকে ধীরে ধীরে, তৃতীয় আশ্রমের উপ যোগী করিয়া তুলিতেছে।

অনেককে, অনেক সময়ে, গৃহীর শরণাপন্ন হইতে হয়। অতিথি, অভ্যাগত প্রভৃতি গৃহস্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। গৃহস্থ-কর্ত্তৃক পরিশ্রমে অক্ষম, অনেক আত্মীয়স্বজন প্রতিপালিত হয়। প্রাচীন ঋষিগণ, আর্য্যসমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও, গৃহস্থের নিকট হইতে, ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া, পরিতৃপ্ত থাকিতেন। পরের উপকারের উদ্দেশেই, গৃহস্থকে, আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে হইত। আত্মসুখসাধন ও আত্মোদরের পূরণ, গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রত, গৃহস্থকে এই সকল কার্য্যসম্পাদনের উপযোগী করিয়া তুলিত। দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যায়, গৃহী, এখন কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছেন। ভোগবিলাস ও সৌখীন ভাব,সমস্ত দূর হইয়াছে। তিনি, নিষ্ঠাবান, ও সংযতচিত্ত হইয়া, সমস্ত কার্য্য করিতে, অভ্যস্ত হইয়াছেন। সংসারের প্রলোভন, তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না, শোকদুঃখ, তাঁহাকে কাতর করিতে সমর্থ হইতেছে না ; পাপ, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইতেছে না। তিনি, প্রথম আশ্রমে থাকিয়া, আধ্যাত্মিক বলসংগ্রহ করিয়াছেন। এই বলে, তাঁহার হৃদয় বলীয়ান হইয়াছে। তিনি সংসারক্ষেত্রে—পাপতাপের রাজ্যে, অটল গিরিবরের ন্যায়, অচলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন ; ফলকামনাশূন্য হইয়া, ঈশ্বরের প্রীতিকর কার্য্যসাধনে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন ; অতিথি, অভ্যাগত ও আর্ত্তজনের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া, ভূলোকে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভার বিকাশ করিতেছেন। দান, গৃহস্থের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

কি শ্রাদ্ধ, কি ব্রত, কি দেবসেবা, কি শান্তি স্বস্ত্যয়ন, সমস্ত বিষয়েই গৃহস্থকে দান করিতে হইত। অন্যান্য আশ্রম, গৃহস্থাশ্রমের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিত। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থের নিকটে ভিক্ষাগ্রহণ করিতেন, বানপ্রস্থ ব্যক্তি গৃহীর দানে জীবনধারণ করিতেন, যতী, গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া, নিরুদ্বেগে ধর্ম্মাচরণে ব্যাপৃত থাকিতেন। গৃহী, দানধর্ম্মের মহিমায়, এইরূপে সকলের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া, সংসারক্ষেত্র গৌরবান্বিত করিয়া তুলিলেন। গৃহস্থের সম্বন্ধে এইরূপ অনুশাসন আছেঃ—"সর্ব্বদা অন্নদান করিবে, ক্ষমা দেখাইবে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিবিষ্ট থাকিবে, সর্ব্বদা সকলের প্রতি যথাচিত সমাদর প্রদর্শন করিবে। রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় ও ক্ষুধার্ত্তকে আহারীয় দিবে। মঙ্গলেচ্ছু, ধীমান ব্যক্তি, দীন দরিদ্র অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য ও অন্নদান করিবেন।" গৃহস্থাশ্রমের কি পবিত্রতাময় চিত্র! গৃহীর কি অপূর্ব্ব দেবভাব! প্রাচীন আর্য্যসমাজে,গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্যের পর, এইরূপ দেবভাবে পূর্ণ হইয়া, নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তির সঞ্চয় করিতেন।

গৃহস্থ, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কেবল বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে, তাঁহার ধর্ম্মাচরণের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে পারে। তিনি, বিষয়সুখে প্রমত্ত থাকিয়া, অনন্ত স্বর্গীয় সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারেন। এই বিঘ্ন দূর করিবার জন্য, তৃতীয় আশ্রম অর্থাৎ বানপ্রস্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন, গৃহস্থের কেশ শ্বেত হইত, দেহের চর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িত, যখন তিনি পুত্রের পুত্র দেখিয়া সুখী হইতেন, তখন তিনি, বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার সংসারপরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি, পুত্রগণকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া, ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশে বনে প্রবেশ করিতেন। এই সময়ে তাঁহাকে বানপ্রস্থ বলা যাইত। তাঁহার স্ত্রীও ইচ্ছা করিলে, তাঁহার অনু-

গমন করিতেন। বানপ্রস্থ ব্যক্তি নির্ব্বিবাদে ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাপৃত হইতেন। তিনি, কিছুকাল কোন কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন। কিন্তু, এই যজ্ঞানুষ্ঠান, গৃহস্থাশ্রমের অনুরূপ ছিল না। বানপ্রস্থকে মানসিক অনুষ্ঠানমাত্র করিতে হইত। তিনি যজ্ঞের সমস্ত অঙ্গই মনে মনে স্মরণ করিতেন। এইরূপ করিলেই, তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত ফললাভ হইত। কিছু দিন পরে, এই অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হইত। বানপ্রস্থ ব্যক্তি, তখন, তপ আরম্ভ করিতেন। স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া, বা পরলোকে পুরস্কারপ্রাপ্তির আশায়, কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক, বানপ্রস্থ ব্যক্তির এইরূপ ধারণা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিত। তিনি নিষ্কামভাবে, নির্ব্বিকারচিত্তে, ধর্ম্মাচরণ করিতেন।

গৃহী, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, দেবারাধনা করিয়াছেন, পবিত্রচিত্তে, ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াছেন, ফলকামনাশূন্য হইয়া, আর্ত্ত জনকে আশ্রয় দিয়াছেন। দেবভক্তির উচ্ছ্বাসে, তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, দেবারাধনায় তাঁহার মন সংগত হইয়াছে, দেবসেবায় তাঁহার নিষ্ঠা, বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া, শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিয়া, চিত্তসংযম অন্তর-শুদ্ধি, ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন। এখন জীবনের শেষ অবস্থায়, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে চিত্তসমর্পণে, তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছে। পবিত্র বেদান্ত, এখন তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই গ্রন্থের সাহায্যে, অনাদি, অনন্ত ঈশ্ব-রের ধ্যানে সংযত হইয়াছেন।

যাহাতে ভোগলালসা দূর হয়, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধনে অনুরাগ জন্মে, বানপ্রস্থ ব্যক্তি তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই বনবাস, তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ ছিল না। ইহা, তাঁহার একটি

পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যাঁহারা, যথানিয়মে ছাত্র ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন নাই, তাঁহারা এই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। মানব-হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় রিপুর দমন জন্য, ঐ দুই অবস্থায়, শিক্ষালাভ করা অতি আবশ্যক। এই শিক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে, গৃহী, বানপ্রস্থ হইয়া, প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন। মনু কহিয়াছেন, "বানপ্রস্থ ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মগ্রন্থের অধ্যয়নে রত থাকিবে, শীত, আতপ প্রভৃতির প্রভাব সহ্য করিতে যত্নশীল হইবে, সকলের উপকার করিবে, মনঃসংযমরক্ষা করিবে, প্রত্যহ দান করিবে, এবং সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিবে।" বানপ্রস্থ ব্যক্তি এইরূপে ভোগসুখে নিস্পৃহ হইয়া, নিসর্গরাজ্যের মনোহর স্থানে, পরম ব্রহ্মের চিন্তা করিতেন।

সর্ব্বশেষে, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধককে আর একটি আশ্রমপালন করিতে হইত। এই আশ্রমের নাম ভৈক্ষ্য অথবা সন্ন্যাসাশ্রম। সন্ন্যাসী, সংসারের অনিত্যতার চিন্তা করিয়া, বৈরাগ্যের অভ্যাস করিতেন। তিনি, তখন কর্ম্মফলের কামনা করিতেন না, স্বকৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গসুখেরও ইচ্ছাকরিতেন না। তিনি নিঃসঙ্গ হইয়া, ব্রহ্মে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেন।

প্রাচীন হিন্দু আর্য্যসমাজের এই আশ্রমচতুষ্টয়, পরস্পরের সহিত কেমন সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ! যেমন সোপানের পর সোপান অতিক্রম না করিলে, মন্দিরে উপনীত হওয়া যায় না, তেমনই, এই আশ্রমচতুষ্টয়ের একটির পর একটি, অতিক্রম না করিলে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করা যায় না। ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চতম প্রদেশে উপনীত হইতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রতের প্রতিপালন করিয়া, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতাসংগ্রহ করিতে হইবে, গৃহস্থ

হইয়া, দেবারাধনা প্রভৃতি দ্বারা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মনঃসংযম লাভ করিতে হইবে, অরণ্যবাস স্বীকার করিয়া, ঈশ্বরের ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতে হইবে, শেষে, এই শেষ আশ্রমে প্রবেশকরিবার অধিকার জন্মিবে।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে, জীবনের শেষ অবস্থায়, এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু অরণ্যে বাস করিলে, বা সন্ন্যাসী হইলেই যে, প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, তাহা হিন্দু আর্য্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারাও জানিতেন, বনে বাস করিলেও, লোকের মন, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় অধীর হইতে পারে। তাঁহাদের বোধ ছিল, সমাজের জনতা ও গোলযোগের মধ্যেও, মানবহৃদয়ে পবিত্র আরণ্য আশ্রম থাকিতে পারে। সেই আশ্রমে, মানব, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এজন্য, নিষ্ঠাবান্, আত্মসংযত হিন্দু, কখন কখন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও, যোগাভ্যাস করিতেন। রাজর্ষি জনক গৃহস্থ হইয়াও, পরমাত্মনিষ্ঠ, যোগী বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, বনে বাস করিলেই ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের প্রকৃত চর্চ্চা করিলেই, কেবল ধর্ম্মলাভ হয়। মনুসংহিতায়ও ঠিক এই ভাব দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে:—সংযমী লোকের অরণ্যবাসের প্রয়োজন কি, অসংযমীরই বা, অরণ্যের আবশ্যকতা কি? সংযমী যেখানে থাকেন, সেই স্থানই অরণ্য, সেই স্থানই আশ্রম। মুনি যদি পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া, গৃহে বাস করেন, আর চিরদিন যদি, শুদ্ধচারী ও দয়াশীল থাকেন, তাহা হইলেই, তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। আত্মা পবিত্র না হইলে দণ্ডধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভারবহন, মুণ্ডন, বল্কল ও অজিনপরিধান, ব্রতপালন, অভিষেচন, যজ্ঞ, বনে বাস, ও শরীরশোষণ, সমস্তই নিষ্ফল।

আর্য্যগণ উল্লিখিত চারি আশ্রমের নিয়মসম্বন্ধে এইরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন চিত্ত শুদ্ধ হইলে, গৃহে থাকিয়াও, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারা যায়। কিন্তু, গৃহে থাকিলে, পাছে, কোনরূপ সাংসারিক প্রলোভনে পড়িতে হয়, পাছে, তাঁহাদের চিত্তসংযমের কোন ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা, জীবনের শেষ অবস্থায় ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে যাইয়া, ঈশ্বরচিন্তা করিতেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা।

মানব, কেবল স্বকীয় কার্য্যের সাধন জন্য, এই পৃথিবীতে অবস্থিতি করে না। তাহাকে, স্বকীয় কার্য্যের ন্যায়, পরকীয় কার্য্যেরও, ভারগ্রহণ করিতে হয়। এই বিশাল বিশ্ব সংসারে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই, অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। প্রভূত ধনশালীর ন্যায়, নিতান্ত দরিদ্রকেও, কোনও না কোনও কর্ত্তব্য-কর্ম্মের ভারগ্রহণ করিতে হয়। ধনী, আপনার সুসজ্জিত প্রাসাদে থাকিয়া, অতুল ধনসম্পত্তিতে কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন। তিনি, এই সংসারকে, সুখের, সম্পদের ও ভোগবিলাসের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থান বলিয়া মনে করিতেছেন। পক্ষান্তরে, দরিদ্র ব্যক্তি, জীর্ণ পর্ণকুটীরে ধূলিশয্যায় শয়ান থাকিয়া, আপনার দুর্ভাগ্যে একান্ত পরিতপ্ত হইয়া, নিরন্তর অশ্রুপাত করিতেছে। তাহার শতধা ছিন্ন, মলিন বসন, কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট কলেবর, বিষাদময় মুখমণ্ডল, সমস্তই দৈন্যের পরিচয় দিতেছে। অবস্থাবিষয়ে,

উভয়ের মধ্যে, ঈদৃশ পার্থক্য থাকিলেও, উভয়কেই সমভাবে কর্ত্তব্যপালন করিতে হয়। ধনী, যেমন ধনোপার্জ্জন, আত্মীয়-স্বজনপালন প্রভৃতি কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন, নিরন্ন দরিদ্রও, তেমনই, উদরান্নের সংস্থান প্রভৃতি কর্ত্তব্যের পালনে যত্নপ্রদর্শন করিয়া থাকে।

মনুষ্য, পরিবারবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে। সুতরাং, তাহাকে প্রথমে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গের সম্বন্ধে কতকগুলি কর্ত্তব্যের পালন করিতে হয়। তৎপরে, আত্মীয়, স্বজন ও স্বজাতীয় লোক, সর্ব্বশেষে সমগ্র মানবজাতি ও অপরাপর জীবের সম্বন্ধেও, তাহাকে কোন না কোন কর্ত্তব্যকর্ম্মে, নিয়োজিত থাকিতে হয়। এই সকল কর্ত্তব্যকর্ম্মের সংখ্যা করা যায় না। মনুষ্যকে, প্রতিক্ষণে, প্রতি অবস্থাতেই, এক একটি কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিতে হয়। কর্ত্তব্যপালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন, কখনও উচিত নহে। যে ব্যক্তি, যথানিয়মে কর্ত্তব্যপালন করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োলাভ হয়। মানুষ, সাতিশয় অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। জীবন ধারণের জন্য, তাঁহাকে প্রত্যেক বিষয়ে, অপরের সাহায্যগ্রহণ করিতে হয়। পিতা মাতার সাহায্য ব্যতিরেকে, সে কখনও পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। শিক্ষকের শিক্ষা ব্যতিরেকে, কখনও তাহার জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। পিতামাতা প্রভৃতির এইরূপ কার্য্য দেখিয়া, সে, ক্রমে বুঝিতে পারে, অপরে, তাহার সম্বন্ধে যেরূপ কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতেছে, তাহাকেও, অপরের সম্বন্ধে, সেইরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপে তাহার হৃদয়ে, কর্ত্তব্য জ্ঞানের উন্মেষ হয়। যাহাতে, এই জ্ঞানের বিস্তার হয়, তৎপক্ষে, সকলের যত্নশীল হওয়া বিধেয়।

পিতামাতা, শিক্ষাগুরু প্রভৃতির আজ্ঞাবহ হইয়া, তাঁহাদের প্রতি

ভক্তিপ্রদর্শন করা, কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তানের বিধেয়। মহানুভাব রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর, জটাচীরধারী হইয়া, কঠোর বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি, কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হন নাই। সৈন্যগণ, এক এক সময়ে, আত্মজীবনে উপেক্ষা করিয়া, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে, যেরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহাতে, তাহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। পূর্ব্বকালে, ইতালিতে পম্পিয়াই নামে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। একদা, একজন সৈনিক পুরুষ, নগরে প্রহরীর কার্য্য করিতে ছিল। এমন সময়ে, সহসা বিসুবিয়স্ নামক ভয়ঙ্কর আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইল। প্রস্তরদ্রবে ও ভস্মস্তূপে, সমস্ত নগর বিধ্বস্ত ও প্রোথিত হইয়া গেল। কিন্তু, নগরের প্রহরী, সৈনিক পুরুষ আপনার সন্নিবেশস্থান হইতে অনুমাত্রও, বিচলিত হইল না। যখন সকলে, প্রাণের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, তখন, সেই প্রহরী, নির্ভীকচিত্তে আপনার স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। নির্দ্দিষ্ট স্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া, প্রহরিতাকরা, তাহার কর্ত্তব্য ছিল। ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সে, এই কর্ত্তব্যের পালন জন্য, সেই স্থানে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার কলেবর ভস্মস্তূপের সহিত মিশিয়া গেল, কিন্তু, তাহার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল। তাহার শিরস্ত্রাণ, অস্ত্র ও বর্ম্ম, অদ্যাপি তদীয় কর্ত্তব্য-পরায়ণতার চিহ্নস্বরূপ, নেপল্‌স্ নগরের চিত্রশালিকায় রক্ষিত আছে। শের শাহ, দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত করিয়া, আশী হাজার সৈন্য লইয়া, মাড়বার আক্রমণ করেন। এই সময়ে, কোনও কারণে, মাড়বারের অধিপতি, আপনার সেনাপতিদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মে, সেনানায়কেরা, গোপনে শত্রুর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, তদীয় সর্ব্বনাশসাধনের

চেষ্টা করিতেছে। কুম্ভনামক একজন সেনাপতি, মাড়বাররাজের ঐ অমূলক বিশ্বাস দূরীভূত করিতে যত্নশীল হন। কিন্তু, তাঁহার যত্ন সফল না হওয়াতে, তিনি, অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া, বিপক্ষের আশী হাজার সৈন্য আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে, কুম্ভ, কর্ত্তব্যপালনে, কিছুমাত্রও ঔদাসীন্যপ্রদর্শন করেন নাই। বিপক্ষের বলবহুলতা দেখিয়াও, তাঁহার হৃদয়ে, কিছুমাত্র ভীতির আবির্ভাব হয় নাই। তিনি, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রর অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন, তথাপি, কর্ত্তব্যপালনরূপ ব্রত হইতে বিচ্যুত হইলেন না। কুম্ভ, অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ ও আত্মজীবনে মমত্বশূন্য হইয়াও, এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহিযুদ্ধের সময়ে, একটি ভারতমহিলা অসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেয়! যুদ্ধের পূর্ব্বে, এই মহিলা অযোধ্যায় একজন ইঙ্গরেজ সেনাপতির পরিবারমধ্যে, ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সেনাপতি, আপনার সন্তানদিগকে ইঙ্গলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন, কেবল একটি কুড়ি মাসের শিশু, তাঁহার ও তদীয় স্ত্রীর নিকটে ছিল। যুদ্ধের সময়ে, উক্ত ধাত্রীর প্রতি, এই শিশুটির প্রতিপালনভার সমর্পিত হয়। একদা প্রাতঃকালে, ধাত্রী, প্রচলিত রীতি অনুসারে শিশুটিকে লইয়া ভ্রমণ করিতেছিল, এমন সময়ে চারিদিকে বিদ্রোহী সিপাহিদিগের ভয়ঙ্কর কলরব শুনিতে পাইল। কোলাহলশ্রবণে সে, দ্রুতবেগে গৃহে আসিয়া জানিতে পারিল, উত্তেজিত সিপাহিগণ সম্পত্তি লুঠিয়া লইতেছে, এবং ইউরোপীয় বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলকেই মৃত্যুমুখে পাতিত করিতেছে। স্নেহময়ী ধাত্রী শিশুটিকে স্থানান্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিবার, আর সময় পাইল না। আপনার বস্ত্রে, তাড়াতাড়ি, উহাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া, গৃহের এক প্রান্তে চাপিয়া রাখিল, এবং সাহসে ভর করিয়া,

তাহার সম্মুখে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সিপাহিরা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, ধাত্রীকে কহিল, "আমরা বিদেশীয় বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলকেই বধ করিব, শিশুটি কোথায় আছে, শীঘ্র বাহির করিয়া দাও।" ধাত্রী শিশুর সম্বন্ধে, বাঙনিষ্পত্তি করিল না, কেবল আপনার সম্বন্ধে, দয়াপ্রার্থনা করিতে লাগিল। সিপাহিগণ, এই প্রার্থনায় সম্মত হইল না, কহিল, "বালকটিকে বাহির করিয়া না দিলে, নিশ্চয়ই তোমাকে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে।" অসহায় ও বিপন্ন সন্তান ধাত্রীর পশ্চাদ্ভাগে বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল। ধাত্রী, ইচ্ছা করিলেই, উহাকে সিপাহিদিগের হস্তে সমর্পিত করিয়া, আপনাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু, অনুপম কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তাহাকে এই নৃশংস কার্য্য হইতে বিরত করিল। ধাত্রী, শিশুর সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না; কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আপনার জন্য, করুণাপ্রার্থনা করিতে লাগিল।

একজন সিপাহি জিজ্ঞাস্য বিষয়ে, ধাত্রীকে নিরুত্তর দেখিয়া, সক্রোধে তাহার বাহুতে তরবারির আঘাত করিল, আহত স্থান হইতে রক্তধারা অনর্গল নির্গত হইতে লাগিল। ধাত্রী, নীরবে এই আঘাত সহ্য করিল। আপনার রক্ষিত বালক কোথায় আছে, কহিল না। ঘাতকের উত্তোলিত অসি, উপর্য্যুপরি তাহার দেহে পতিত হইতে লাগিল, অসহায় অবলা, কেবল আপনার বাহু দ্বারা, তরবারির নিদারুণ আঘাত হইতে মস্তকরক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরে প্লাবিত হইয়া উঠিল; অবলা আর সহিতে পারিল না, হতচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িল। এদিকে, সিপাহিরা লুণ্ঠনাশয়ে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল; স্নেহময়ী ধাত্রীর স্নেহের ধন, রক্ষাকারিণীর পার্শ্বে, নিরাপদে বস্ত্রাচ্ছাদিত রহিল।

ধাত্রী সংজ্ঞা লাভ করিয়া, শিশুটিকে লইয়া, আপনার বাটীতে উপস্থিত হইল; এবং লোকে ইঙ্গরেজবালক বলিয়া মনে করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে উহার গাত্রে এক প্রকার রঙ্গ মাখাইয়া দিল। কিছুদিন পরে, সে শুনিতে পাইল, তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী, উভয়েই লক্ষ্ণৌনগরে আছেন। এই সংবাদ শুনিয়া, কর্ত্তব্যপরায়ণা পরিচারিকা, শিশুটিকে লইয়া, তথায় উপস্থিত হইল এবং প্রীতি-প্রফুল্লহৃদয়ে, প্রভু ও প্রভুপত্নীর হস্তে, তাঁহাদের হৃদয়রঞ্জন স্নেহের পুত্তলী সমর্পিত করিল। সেনাপতি ও তাঁহার বনিতা, আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত শিশুটিকে গ্রহণপূর্ব্বক শান্তি স্থাপিত হইলে, ধাত্রীকে সমুচিত পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আহত স্থান ভালরূপে শুষ্ক না হওয়াতে, ধাত্রী, লক্ষ্ণৌ হইতে আপনার বাসগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যত দিন, সিপাহিরা লক্ষ্ণৌ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন, সে, ঐ স্থানেই অবস্থিতি করে। ইহার পরে, উক্ত নগর শত্রুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইলে, ধাত্রী অনুসন্ধান করিয়া জানিল, তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী, উভয়েই আক্রমণের সময়ে নিহত হইয়াছেন। যাহাকে, সে, শরীরের শোণিত-পাত করিয়া, আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল, অপরিসীম সাহস ও দৃঢ়তার সহিত লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, সে, অপরাপর অনাথ শিশু সন্তানের সহিত ইঙ্গলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

পরে, এই কর্ত্তব্যপরায়ণা মহিলা, অযোধ্যার ডেপুটি কমিশনরের গৃহে ধাত্রীর কার্য্যে নিয়োজিতা ছিল। অনেকেই, তাহার নিকটে, উক্ত বিবরণ শুনিয়াছেন, অনেকেই তাহার শরীরের ক্ষত স্থান দর্শন করিয়াছেন। ঐ ক্ষতগুলি, তাহার অসীম সাহসও অবিচলিত কর্ত্তব্যপরায়ণতার গৌরবসূচক অমূল্য ভূষণস্বরূপ ছিল। এই গৌরবকাহিনী বলিবার সময়ে, তাহার মুখমণ্ডলে কোন প্রকার

গর্ব্বের চিহ্ন লক্ষিত হইত না। জিজ্ঞাসা করিলে, সে, নিরতিশয় বিনীতভাবে সকলের নিকটে, উহা ব্যক্ত করিত।

উক্ত সময়ে, বামনী নামে একটি দরিদ্রা রমণী, এক জন ইঙ্গরেজ ডাক্তরের পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ডাক্তর সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে অযোধ্যাস্থিত সৈনিকনিবাসে, চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা, নিশীথসময়ে সংবাদ আসিল, অযোধ্যার সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তর, কার্য্যানুরোধে স্বয়ং পলাইতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তিনটি শিশু সন্তানের সহিত অবিলম্বে শকটারোহণে, লক্ষ্ণৌ যাইতে পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসকপত্নী, সম্মুখে যাহা পাইলেন, তৎসমুদয়, তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠাইয়া, সন্তানত্রয়ের সহিত লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ডাক্তর, অপরাপর ইঙ্গরেজরা, যেখানে আত্মরক্ষার্থ সজ্জিত ছিলেন, সেইখানে উপনীত হইলেন। চারি দিকে সিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই ভয়ঙ্কর সময়ে, চিকিৎসকরমণী, তিনটি সন্তান ও দুইটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত সভয়ে, রাজপথ অতিবাহন করিয়া, লক্ষ্ণৌ গমন করিলেন। চিকিৎসক, দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আর গৃহে গমন করিলেন না, অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের সহিত সিপাহিগণের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে বামনী প্রভুর পরিত্যক্ত গৃহে নিষ্কর্ম্মা ছিল না। তাহার প্রভুপত্নী যেখানে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য সম্পত্তি রাখিতেন, তাহা সে জানিত, এক্ষণে কালবিলম্ব না করিয়া, সেই সমস্ত মূল্যবান্ আভরণরাশি সংগ্রহ পূর্ব্বক, গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণ

মধ্যে, সিপাহিগণ আসিয়া সেই গৃহে অগ্নিপ্রদান করিল। চিকিৎসক দূর হইতে দেখিলেন, তাঁহার গৃহ, করাল অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বামনী যে, সমস্ত অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহা, কেহই জানিতে পারে নাই। সুতরাং, সে ইচ্ছা করিলেই, ঐ সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে পারিত। আভরণগুলি বিক্রয় করিলে, যে টাকা হইত, তাহা, বামনী আপনার জীবিতকালমধ্যে কখনও উপার্জ্জন করিতে পারিত না। কিন্তু, কর্ত্তব্যপরায়ণা, বিশ্বস্তা, অবলা এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না। সাধুতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার সম্মান, তাহার নিকটে উচ্চতর বোধ হইল। দরিদ্রা বামনী অবলীলায় লোভ সংবরণ করিয়া, প্রভুপত্নীর সমস্ত দ্রব্য, সযত্নে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

নগরের নিকটে, সামান্য পল্লীতে বামনীর আবাসবাটী ছিল। বামনী আপনার গৃহে আসিয়া, একখানি ফ্লানেলের কাপড়ে আভরণগুলি জড়াইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিল। সে, কেবল আপনার উপরেই বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিল, আপনার ন্যায় আত্মীয়দিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত করিতে পারে নাই, সুতরাং তাহাদের নিকটে, এ বিষয় ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিল না। এক বৎসরেরও অধিক কাল, এই ভাবে গত হইল, এক বৎসরেরও অধিক কাল, চিকিৎসকপত্নীর বহুমূল্য সম্পত্তি, বিশ্বস্তা বামনীর কুটীরে, মৃত্তিকার নীচে রহিল। শেষে লক্ষ্ণৌ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইল, শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইল, সুখসমৃদ্ধিতে অযোধ্যা পুনর্ব্বার শোভিত হইয়া উঠিল। চিকিৎসক, আর এক সেনানিবাসে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণীও, সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বামনী, এই সংবাদ পাইয়া, তথায় গমন করিল, এবং প্রভু ও প্রভুপত্নীর অস্তিত্বসম্বন্ধে, নিঃসন্দেহ হইবার

জন্য, অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। যখন, আর কোন সন্দেহ রহিল না, তখন সে, নীরবে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিল, নীরবে মৃত্তিকা হইতে সমস্ত আভরণ বাহির করিল, নীরবে ও সাবধানে, তৎসমুদয় লইয়া, পুনর্ব্বার প্রভু ও প্রভুপত্নীর নিকটে সমাগত হইল। বামনী, অক্ষতশরীরে প্রত্যাগত হইয়াছে দেখিয়া, চিকিৎসক ও তাঁহার পত্নী বিস্মিত হইলেন, পরে, যখন দেখিলেন, বামনী তাঁহাদের পরিত্যক্ত সমুদয় বহুমূল্য আভরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। দরিদ্রা পরিচারিকা, বিনম্রভাবে একে একে সমস্ত অলঙ্কার বুঝাইয়া দিল। চিকিৎসক ও তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন, অলঙ্কারাদির কিছুই অপহৃত হয় নাই। তাঁহারা পরিচারিকার এই অসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পুরস্কার স্বরূপ, দ্বিগুণবেতনে, তাহাকে পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বামনী, এইরূপে প্রভুপরিবারের বিশ্বাসভাজন হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

পূর্ব্বকালে আয়োদধৌম্যনামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার এক শিষ্যের নাম আরুণি। আয়োদধৌম্য বড় সদয়প্রকৃতি ছিলেন না। শিষ্যেরা কতদূর কষ্ট সহিতে পারে, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য, তিনি সময়ে সময়ে, শিষ্যদিগকে অনেক কঠোর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। শিষ্যগণ, বাল্যকাল হইতেই পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি, একদিন আরুণিকে ধান্যক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে বলিলেন। আরুণি, গুরুর আদেশে ক্ষেত্রে যাইয়া আলি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অনেক যত্ন করিয়াও, আলি বাঁধিয়া ক্ষেত্রস্থিত জলরোধ করিতে পারিলেন না। তখন নিজে সেই স্থানে শুইয়া জলের পথরোধ করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল; আরুণি, কেদারখণ্ড হইতে

উঠিলেন না। অনন্তর, গুরু অপরাপর শিষ্যদিগকে আরুণির কথা জিজ্ঞাসিলে, তাহারা কহিল, “আরুণি, আপনার আদেশে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে গিয়াছে।” গুরু কহিলেন, “যেখানে আরুণি গিয়াছে, চল, আমরাও সেইখানে যাই।” পরে, আয়োদ ধৌম্য সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, আরুণিকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “বৎস আরুণি, কোথায় গিয়াছ, আমার নিকটে আইস।” আরুণি, গুরুর কথায় তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া আসিয়া অতি বিনীতভাবে গুরুকে কহিলেন, “ক্ষেত্র হইতে যে জল বাহির হইতেছিল, তাহা অবারণীয় বোধ হওয়াতে, তৎ-প্রতিরোধ জন্য, আমি নিজে শয়ন করিয়াছিলাম। এখন আপনার কথায় উঠিয়া আসিলাম। অভিবাদন করি, আর কি আদেশ-পালন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।” আয়োদধৌম্য শিষ্যের এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া কহিলেন, “বৎস, তুমি যথাশক্তি আমার আদেশপালন করিয়াছ, তোমার মঙ্গল হইবে। সমস্ত বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, তোমার আয়ত্ত হইয়া উঠিবে। তুমি, কেদারখণ্ড ভেদ করিয়া উঠিয়াছ, এজন্য, অদ্য হইতে তুমি ‘উদ্দালক’ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।” আরুণি, এইরূপে কর্ত্তব্যপালনপূর্ব্বক গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া, অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইলেন।

কর্ত্তব্যপালনে, যাঁহারা এইরূপ যত্ন, মনোযোগ ও অধ্যবসায়প্রদর্শন করেন, তাঁহারা, ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

সম্পূর্ণ।